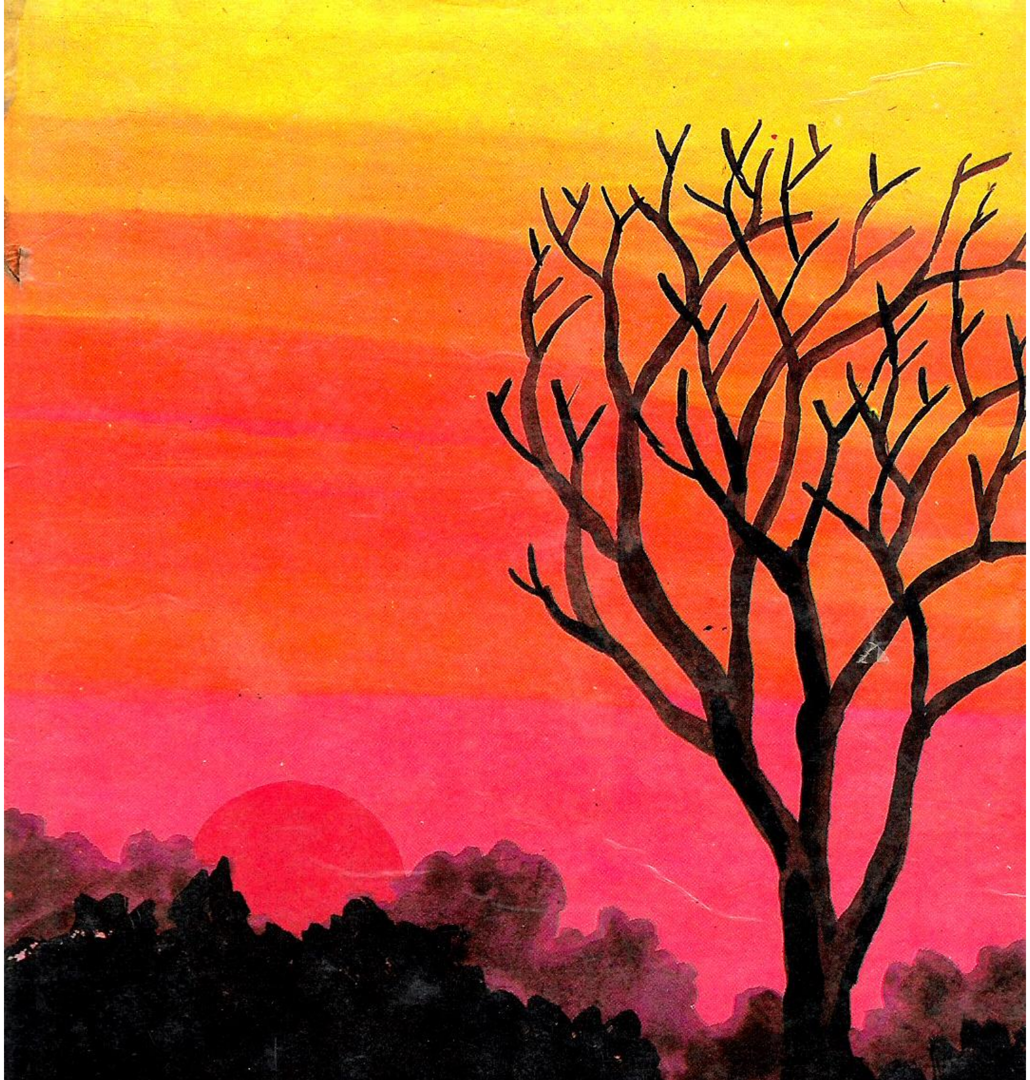

বিদায় বেলায়

কাসেম বিন আবুবাকার

বিদায় বেলায়

কাসেম বিন আবুবাকার

ভূমিকা

মহান রাব্বুল আল–আমিনের শুকরিয়া আদায় করে শুরু করছি।

এই উপন্যাসখানা গ্রামবাংলার এক বাস্তব ঘটনা। নৈতিক কারণে শুধু নায়কের নাম ছাড়া আর বাকি সমস্ত নাম–ধাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এর কাহিনীতে দু'টো দিক ফুটে উঠেছে। প্রথমটা হল, সত্যিকার প্রেমের মধ্যে যে, কোন মোহ বা স্বার্থ নেই, তা এই ঘটনাটাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর দ্বিতীয়টা হল, মেয়েরা সাধারণতঃ যে সুখের পায়রা, তারও জ্বলন্ত প্রমাণ এটার মধ্যে রয়েছে। এর কাহিনী শুরু হয় নায়ক নায়িকার কিশোর বয়স থেকে। পরিসমাপ্তি ঘটে উপযুক্ত বয়সে। এরকম ঘটনা শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই অহরহ ঘটছে। সে সবের কটারইবা খবর আমরা রাখি? আর রাখাও সম্ভব নয়। এই কাহিনী পড়ে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক পথে চলুক, এই কামনা আল্লাহ পাকের দরবারে করছি।

ওয়াস সালাম
লেখক

১৭ই আশ্বিন ১৪০০ বাংলা
১৪ই রবি-সানি ১৪১৪ হিজরী
২রা ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

১. ফুটন্ত গোলাপ
২. বিদেশী মেম
৩. ক্রন্দসী প্রিয়া
৪. প্রেমের পরশ
৫. বিলম্বিত বাসর
৬. প্রেম বেহেস্তের ফল
৭. একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল
৮. পাহাড়ী ললনা
৯. শরীফা
১০. শ্রেয়সী
১১. বিদায় বেলায়
১২. শেষ উপহার (যন্ত্রস্থ)
১৩. আদর্শ স্ত্রী (যন্ত্রস্থ)
১৪. আদর্শ স্বামী (যন্ত্রস্থ)
১৫. ভাঙ্গা গড়া (যন্ত্রস্থ)

এক

ঢাকা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে মুন্সীগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে করে মুন্সীগঞ্জে যেতে হয়। তবে সরকারী ও বেসরকারী গাড়ী পারাপারের জন্য পঞ্চবটী রোডের দক্ষিণে ধলেশ্বর নদীতে মুক্তারপুর ফেরীঘাট আছে। নারায়ণগঞ্জের পূর্বকোল ঘেঁষে শীতলক্ষা নদী প্রবাহিত। আর দক্ষিণে ধলেশ্বর নদী। এই নদীর দক্ষিণ পাড়ে মুন্সীগঞ্জ। এটা একটা উপশহর। এখানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কোর্ট-কাচারী, জিলা পরিষদ ও বিভিন্ন অফিস এবং হাসপাতাল আছে।

বর্ষাকাল। খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, নদী-নালা ও মাঠ-ঘাট পানিতে থৈ থৈ করছে। গ্রামের মেঠো পথগুলোয় একহাঁটু কাদা। মুন্সীগঞ্জের এদিকের রাস্তাগুলো এখনো পাকা হয়নি। তবে গ্রামের পাশ থেকে একটা বিশফুট চওড়া পাকা রাস্তা মুন্সীগঞ্জ থেকে টঙ্গিবাড়ী হয়ে বালিগাঁও পর্যন্ত চলে গেছে। যারা শহরে চাকরি বা লেখাপড়া করে অথবা কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাতায়াত করে, তারা বর্ষার সময় বাড়ী থেকে জুতো হাতে করে এসে পাকা রাস্তার ধারে ডোবার পানিতে পা ধুয়ে জুতো পায়ে দিয়ে চলাচল করে। মুন্সীগঞ্জের তিনচার মাইল দক্ষিণে এমনি একটা গ্রাম আলদি বাজার। গ্রামটা বেশ বড়। চার পাঁচটা পাড়া নিয়ে এই গ্রাম। গ্রামের উত্তর পাড়ায় আব্দুস সাত্তারের বাড়ী। উনি একজন আলেম। কুমিল্লার এক মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। উনাদের বংশে বেশ কয়েকজন আলেম ও হাফেজ আছেন। উনারা দেশের বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। আব্দুস সাত্তারের এক ছেলে তিন মেয়ে। মেয়ে তিনটে ছোট। ছেলটা বড়। নাম আব্দুস শামী। ডাক নাম শামী। আব্দুস সাত্তার ছেলেকে প্রথমে মক্তবে এবং পরে কওমী মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। শামী খুব মেধাবী ছাত্র। পাঞ্জাম পর্যন্ত খুব ভালভাবে পড়াশুনা করল। পাঞ্জামের ফাইন্যাল পরীক্ষার পর গ্রামের কিছু বাজে ছেলেদের পাল্লায় পড়ে মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিল।

তার মা মাসুমা বিবি একদিন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে তুই মাদ্রাসায় যাচ্ছিস না কেন?

শামী বলল, আমার পড়তে ভাল লাগে না।

মাসুমা বিবি খুব অবাক হয়ে বললেন, কেন?

ঃ কেন আবার? বললাম তো পড়তে ভাল লাগে না।

ঃ তোর আব্বা শুনলে তোকে আস্ত রাখবে না। কাল থেকে নিয়মিত মাদ্রাসায় যাবি।

ঃ না, আমি আর পড়ব না।

ঃ কি করবি তাহলে? সারাদিন গ্রামের আজেবাজে ছেলেদের সাথে বোম বোম করে ঘুরে বেড়াতে খুব ভাল লাগে বুঝি? ঘরে আসুক তোর আব্বা, এলে মজা বুঝবি।

কিছু না বলে শামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাসুমা বিবি ছেলের স্পর্দা দেখে যেমন খুব অবাক হলেন তেমনি রেগে গেলেন। ভেবে রাখলেন, খাবার সময় এলে যা করার করব। তারপর এক সময় একটা বাঁশের কঞ্চি জোগাড় করে রাখলেন।

শামী সেদিন সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে রাতে ঘরে ফিরল। সে আজ সমস্ত দিন কিছু খায়নি। তার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। রাতে ঘরে এসে মাকে বলল, খেতে দাও।

শামী বাইরে চলে যেতে এবং সারাদিন বাইরে থাকায়, মাসুমা বিবি খুব রেগে ছিলেন। কিন্তু ছেলের মলিন মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন, সারাদিন কিছু খায়নি। তাই রাগটা চেপে রেখে ভাত বেড়ে খেতে দিয়ে বললেন, যাদের সাথে সারাদিন ঘুরে বেড়ালি তারা খেতে দেয়নি? নামায পড়েছিস, না তাও ছেড়ে দিয়েছিস?

শামী হাত ধুয়ে খেতে খেতে বলল, মসজিদ থেকে এশার নামায পড়েই তো এলাম।

মাসুমা বিবি আর কিছু বললেন না।

শামী খেয়ে উঠে ঘুমোতে গেল।

মাসুমা বিবি একটু পরে কঞ্চিটা নিয়ে রুমে এসে সপাং সপাং করে শামীকে মারতে মারতে বললেন, তুই পড়বি না কেন বল? না পড়লে তোকে আজ শেষ করে ফেলব।

শামী ভাবতেই পারেনি আম্মা তাকে মারবে। কারণ প্রথম সন্তান ও এক ছেলে বলে আম্মা তাকে ভীষণ ভালবাসে। তাকে মারধর করা তো দূরের কথা, কোন দিন চোখ পর্যন্ত রাঙ্গায়নি। বরং আব্বা যদি কখনো সখনো কোন কারণে বকাবকি করলে, আম্মা আব্বার উপর রাগ করে বলেছে, এতটুকু ছেলেকে তুমি এরকম করছ কেন? তারপর তাকে আদর করতে করতে আব্বার সামনে থেকে নিয়ে চলে গেছে। সেই আম্মাকে আজ কঞ্চি দিয়ে মারতে দেখে তার ভীষণ অভিমান হল। আম্মার চাবুকের আঘাত খেয়ে বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে চোখের পানি ফেলতে লাগল, তবু চিৎকার করে কান্নাকাটি করল না।

মাসুমা বিবি একসময় ক্লান্ত হয়ে মার থামিয়ে বললেন, এখন কি হয়েছে? তোর আব্বা এসে কি করে দেখবি। তারপর রুম থেকে বেরিয়ে এসে কঞ্চিটা ভেঙ্গে দু'তিন টুকরো করে উঠোনের একদিকে ছুঁড়ে দিলেন।

তিনি যখন শামীকে মারতেছিলেন তখন ছোট মেয়ে তিনটেও সেখানে ছিল। তারা আম্মাকে কোন দিন এত রাগতে বা কাউকে মারতে দেখেনি। ভাইয়াকে মারতে দেখে তারা কান্না জুড়ে দিয়েছিল।

মাসুমা বিবি সেসব গ্রাহ্য না করে খাবার ঘরে এলেন। কিন্তু ভাত খেতে পারলেন না। হাঁড়ী-পাতিল ও থালা বাসন গুছিয়ে রেখে এক গ্লাস পানি খেয়ে ঘুমোতে গেলেন। তিনি ছেলেমেয়ের গায়ে কখনো হাত তুলেননি। আজ রাগের

মাথায় ছেলেকে মেরেছেন। এখন রাগ পড়ে যেতে চোখের পানিতে বুক ভাসাতে লাগলেন। তবু ছেলেকে প্রবোধ দিতে গেলেন না। ভাবলেন, প্রবোধ দিতে গেলে ওর সাহস আরো বেড়ে যাবে। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি ঘুমোতে পারলেন না।

পরের দিন শামীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সকালে তাকে দেখতে না পেয়ে মাসুমা বিবি ভাবলেন, রাগ করে হয়তো বন্ধুদের কাছে গেছে। দিনে না ফিরলেও রাতে ঠিক ফিরবে। কিন্তু অনেক রাত হয়ে যেতেও যখন ফিরল না তখন বেশ চিন্তিত হলেন। তারপর দু-তিন দিন হয়ে যেতেও যখন শামী ঘরে ফিরল না তখন তিনি সবকিছু লিখে স্বামীকে চিঠি দিলেন।

একই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার রায়হান নামে একটা ছেলের সঙ্গে শামীর খুব বন্ধুত্ব। মাদ্রাসায় পাঞ্জাম পর্যন্ত একসাথে পড়েছে। তাদের বংশ খুব ভাল। তাদের বংশেও বেশ কয়েকজন আলেম ও হাফেজ আছে। রায়হানও ভাল ছাত্র। রেজাল্ট বেরোবার পর শামী যখন মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিল তখন একদিন রায়হান তার সঙ্গে দেখা করে বলল, কিরে তুই আর মাদ্রাসায় যাসনি কেন?

শামী বলল, আমি আর পড়ব না।

রায়হান জানতে পেরেছিল, সে গ্রামের আজে বাজে ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে। তাই বলল, তুই আমার চেয়ে ভাল ছাত্র। এসব বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে পড়াশুনা ছেড়ে দিলি, এটা কি ঠিক হল? তোর আব্বা-আম্মা কিছু বলেন না?

শামী বলল, তারা আবার কি বলবে, আমার পড়াশুনা করতে ভাল লাগে না।

ঃ কি করিব তাহলে?

ঃ তা এখনো ভাবিনি।

ঃ আমার কি মনে হয় জানিস, তুই ঐসব খারাপ ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে এরকম হয়ে গেছিস। আমি বলছি, ওদের সাথে আর মেলামেশা না করে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যা।

ঃ ঠিক আছে, এখন তুই যা। তোর কথা ভেবে দেখব।

সেদিন রায়হান আর কিছু না বলে ফিরে এলেও ও শামীর কথা ভুলতে পারল না। অনেক দিনের বন্ধুত্ব, সহজে কি ভুলা যায়। তাই মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করে গল্প গুজব করার সময় মাদ্রাসায় ভর্তি হবার তাগিদ দেয়। এই কয়েক দিন তাকে দেখতে না পেয়ে একদিন রায়হান শামীদের বাড়ীতে এসে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, চাচী আম্মা শামী কোথায়?

মাসুমা বিবি রায়হানকে চেনেন। অনেকবার শামীর সঙ্গে এসেছে। বললেন, সে তো কয়েক দিন থেকে বাড়ীতে নেই। কোথায় গেছে বলেও যাইনি। রায়হান আবার জিজ্ঞেস করল, ও আর মাদ্রাসায় যায়নি কেন? সেকথা আমি জিজ্ঞেস করতে বলল, সে আর পড়বে না। আপনারা ওকে কিছু বলেননি?

মাসুমা বিবি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করতে আমাকেও তাই বলেছে। সেইজন্যে একদিন মেরেছিলাম। তারপরের দিন থেকে না বলে কোথায় চলে গেছে। তুমি একটু খোঁজ করে দেখোতো বাবা। দেখা হলে তাকে পড়াশুনা করার জন্য বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ীতে আসতে বলো।

রায়হান বলল, আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। ও বলে আমার পড়তে ভাল লাগে না। ঠিক আছে, খোঁজ করে দেখব। দেখা হলে আবার বোঝাব। তারপর সালাম জানিয়ে ফিরে এল।

স্ত্রীর চিঠি পেয়ে আব্দুস সাত্তার বাড়ীতে এসে সবকিছু শুনে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, তুমি যখন মারতে সে বাড়ী ছাড়া-তখন আমি মারলেও কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আমি বাড়ীতে এসেছি শুনলে ভয়ে আর এদিকে পা মাড়াবে না। আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করে দেখ, নিশ্চয় ফিরে আসবে। আমি কাল চলে যাব। চলে যাবার পর বড় ভাইয়ের ছেলে মান্নানকে একবার মোল্লাকান্দিতে ওর নানার বাড়ীতে খোঁজ নিতে পাঠাবে। যদি সেখানে থাকে, তাহলে তাকে যেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসে। আমিও মান্নানকে বলে যাব। তাকে আর মারধর করো না। কয়েকদিন পরে আমি এসে যা করার করব। মাদ্রাসা কমিটির মিটিং চলছে। একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। কালকেই আমাকে যেতে হবে।

পরের দিন সকালে আব্দুস সাত্তার চলে যাবার পর মাসুমা বিবি ভাসুরপো মান্নানকে বাবার বাড়ীতে পাঠালেন।

মান্নান শামীর চেয়ে অনেক বড়। কলেজে পড়ে। মোল্লাকান্দি গিয়ে শামীকে নিয়ে এল।

মাসুমা বিবি ছেলেকে কিছু বললেন না। বরং আদর করে খেতে দিয়ে বললেন, আমি তোর আম্মা না? আম্মা মেরেছে বলে রাগ করে চলে গেলি। আমার চিন্তা হয়নি বুঝি? তোর আব্বা এসেছিল। তুই পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছিস শুনে খুব দুঃখ পেয়েছে। তোকে মাদ্রাসায় ভর্তি হতে বলেছে।

শামী কিছু না বলে চুপ করে খেতে লাগল।

মাসুমা বিবি তখন আর কিছু বললেন না।

দিন দশেক পর আব্দুস সাত্তার বাড়ীতে এলেন। রাতে শামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই পড়াশুনা করতে চাচ্ছিস না কেন?

শামী ভয়ে কোন কথা বলতে পারল না। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আব্দুস সাত্তার হুংকার ছেড়ে বললেন, কথার উত্তর দিচ্ছিস না কেন?

শামী আরো বেশি ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল।

আব্দুস সাত্তার তার অবস্থা দেখে রাগ সংযত করে বললেন, কালকেই তোকে আমি ভর্তি করে দেব। মন দিয়ে পড়াশুনা করবি।

পরের দিন আব্দুস সাত্তার শামীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন। তারপর চার-পাঁচ দিন বাড়ীতে থেকে তিনি কর্মস্থলে ফিরে গেলেন।

যে কয়দিন আব্বা বাড়ীতে ছিল সেই কয়দিন শামী মাদ্রাসায় গেল এবং বাড়ীতেও পড়াশুনা করল। উনি চলে যাবার পর সবকিছু বন্ধ করে দিল।

মাসুমা বিবি ছেলেকে প্রথমে অনেক বোঝালেন। তাতে কাজ না হতে ভীষণ

রাগারাগি করলেন। কিন্তু শামীর কোন পরিবর্তন হল না। সে আগের মত সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়াতে লাগল। আব্বা বাড়ীতে এলে শামী নানার বাড়ী, খালার বাড়ী নয়তো ফুপুর বাড়ী চলে যায়। উনি চলে যাবার পর আবার বাড়ীতে আসে। এভাবে প্রায় দু'বছর পার হতে চলল।

একদিন শামী বন্ধুদের সাথে রাস্তায় আড্ডা দিচ্ছিল। এমন সময় তিনটে মেয়েকে স্কুলে যেতে দেখে জামালকে জিজ্ঞেস করল, সবার আগে আগে যে মেয়েটা যাচ্ছে তাকে চিনিস?

জামালের বাড়ী এই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়। সে মেয়েটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, ওতো আমাদের পাড়ার আবসার উদ্দিন চাচার মেয়ে ফাহমিদা।

শামীদের বাড়ী উত্তর পাড়ায়। তাই সে ফাহমিদাকে দেখলেও কম দেখেছে। এখন তার নাদুস-নুদুস চেহারা ও রূপ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। বলল, তাইতো চেনা চেনা মনে হচ্ছে। অনেক দিন দেখিনি বলে ঠিক চিনতে পারিনি। শামী ফাহমিদাকে যতদূর দেখা গেল ততদূর পর্যন্ত তার দিকে চেয়ে রইল। তাকে দেখে তার কিশোর মনে কি এক রকমের যেন অনুভূতি জন্মাল। এরপর থেকে সে ফাহমিদাকে স্কুলে যাতায়াতের সময় একাকি আড়াল থেকে দেখতে লাগল। প্রতিদিন তাকে দেখা যেন তার নেশা হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন দিন তার মুখোমুখি হতে সাহস করল না। এভাবে কিছু দিন যাবার পর তার মনের পরিবর্তন হল। চিন্তা করল, গ্রামে আরো কত মেয়ে আছে, কই তাদেরকে তো দেখতে ইচ্ছা করে না? ওকে দেখার জন্য মন এত উতলা হয় কেন? যদি কোন দিন ফাহমিদা স্কুলে না যায়, সেদিন মন খুব খারাপ হয়ে থাকে কেন? হঠাৎ তার মন বলে উঠল, ফাহমিদা বড় লোকের মেয়ে। তোমরা তাদের তুলনায় কিছুই না। তাছাড়া সে লেখাপড়া করছে, আর তুমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আজে বাজে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছ। ফাহমিদাকে যদি তোমার ভাললাগে, তাকে যদি আপন করে পেতে চাও, তাহলে তুমি ভালভাবে লেখাপড়া করে তাকে টেক্কা দাও। ভাল ছাত্রকে সকলে ভালবাসে। ভাল ছাত্র হতে পারলে, শুধু ফাহমিদা কেন, তারমত সব মেয়েরা তোমাকে ভালবাসবে। এইসব চিন্তা করে সে সিদ্ধান্ত নিল, মাদ্রাসায় না পড়ে স্কুলে পড়বে। একদিন শামী তার মাকে বলল, এবারে আব্বা এলে তাকে বলো, আমি মাদ্রাসায় পড়ব না, স্কুলে পড়ব। আর স্কুলে ভর্তি হবার সময় তো এখনো তিন চার মাস বাকি। এই কমাস প্রাইভেট মাস্টারের কাছে অংক ও ইংরেজী শিখব।

মাসুমা বিবি ছেলের কথা শুনে খুশী হলেন। বললেন, ঠিক আছে আজই আমি সে কথা লিখে তোর আব্বাকে চিঠি দিচ্ছি।

স্ত্রীর চিঠি পেয়ে আব্দুস সাত্তার এক বৃহস্পতিবারে বাড়ী এলেন। এক সময়ে স্ত্রীকে বললেন, আমার খুব ইচ্ছা ছিল, ওকে একজন বড় আলেম করাব। ভেবেছিলাম ওকে আমার কাছে রেখে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেব। কিন্তু ও যখন মাদ্রাসায় না পড়ে স্কুলে পড়তে চাচ্ছে তখন আর কি করা যাবে। আজকাল ছেলেদেরকে শাসন করলে বাড়ী থেকে পালিয়ে যায়। ঠিক আছে, ও স্কুলেই পড়ুক।

প্রত্যেকবারে আব্বা বাড়ীতে এলে শামী যে কোন আত্মীয়ের বাড়ী পালিয়ে যায়। এবারে গেল না। সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় মাকে বলল, তুমি আব্বাকে আমার কথা বলেছিলে?

আব্দুস সাত্তার বাড়ীতে ছিলেন না। শামী যখন নাস্তা খেতে খেতে মাকে ঐ কথা বলল ঠিক তখনই তিনি বাড়ীতে এলেন। শামীকে নাস্তা খেতে দেখে বললেন, নাস্তা খেয়ে আমার কাছে আসবি, কথা আছে। তারপর তিনি ঘরের ভিতরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন।

মাসুমা বিবি স্বামীকে নাস্তা খেতে দিলেন।

শামী নাস্তা খেয়ে ঘরে ঢুকে এক পাশে দাঁড়াল।

আব্দুস সাত্তার খেতে খেতে বললেন, তোর আম্মা বলছিল, তুই নাকি তিন চার মাস প্রাইভেট পড়ে স্কুলে ভর্তি হতে চাচ্ছিস?

শামী মাথা নিচু করে বলল, জ্বী।

আব্দুস সাত্তার বললেন, পড়তে চাচ্ছিস ভাল কথা, কিন্তু আবার যদি পাগলামি করিস, তাহলে একদম জানে শেষ করে দেব।

শামী কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

মাসুমা বিবি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুই কোন মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়বি বলছিলি, তার কাছে গিয়ে বেতন ঠিক করে পড়াশুনা শুরু কর।

শামী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রামপালের দিকে রওয়ানা দিল।

আলদি বাজার থেকে প্রায় দু-আড়াই মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে রামপাল। সেখানে বালক ও বালিকাদের আলাদা হাই স্কুল আছে। শামী স্কুলে পড়ার সিদ্ধান্ত নেবার পর একদিন রামপালে গিয়ে স্কুলের ফণিভূষণ স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ার কথা বলে রেখেছিল। আজ তার কাছে বেতন ঠিক করে এল।

পরের দিন থেকে শামী ফণিভূষণ স্যারের কাছে পড়তে লাগল। আর ঘরে ও রীতিমত পড়তে লাগল। তারপর জানুয়ারী মাসে রামপাল বয়েজ হাই স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হল। স্কুলে ভর্তি হবার পরও সে ফণিভূষণ স্যারের কাছে ছুটির পর প্রাইভেট পড়ে বাড়ী ফিরে।

শামী আগেই জেনেছিল, ফাহমিদা রামপাল গার্লস হাই স্কুলে পড়ে, স্কুলে যাতায়াতের পথে মাঝে-মধ্যে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। তবে পাশ থেকে যাবার সময় দু'জন দু'জনকে চোরা চাহনিতে দেখে। কয়েকবার চোখে চোখও পড়েছে। তাতেই দু'জন দু'জনের মনের ভাব একটু বুঝতে পারে। ফাহমিদার সঙ্গে সব সময় রাহেলা ও জোবেদা থাকে। তাই শামীর ফাহমিদার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারে না। রাহেলা ও জোবেদা এই গ্রামেরই মেয়ে। রাহেলার বাড়ী পূব পাড়ায় আর জোবেদাদের বাড়ী ফাহমিদাদের পাড়ায়। তারাও ক্লাস এইটে পড়ে।

হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় শামী স্ট্যাণ্ড করতে না পারলেও ফোর্থ হল। কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে ক্লাস নাইনে উঠল।

ফাহমিদা নিচের ক্লাস থেকে প্রতি বছর ফার্স্ট হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না। সেই জন্যে তাকে নিয়ে কেউ সমালোচনা করল না। কিন্তু শামী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। তাছাড়া দু'বছর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিল। সে ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠতে গ্রামের লোকেরা তার সমালোচনা করে বলল, ছেলেটা ভবিষ্যতে খুব উন্নতি করবে।

বর্ষার সময় একদিন স্কুল ছুটি হবার কিছুক্ষণ আগে ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। ছুটির পরও থামার কোন লক্ষণ নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলেই অপেক্ষা করতে লাগল। যখন ঝড় বৃষ্টি একটু কমল তখন তারা ভিজে ভিজে যে যার বাড়ীর পথে রওয়ানা দিল। ফাহমিদাও ভিজে ভিজে যেতে লাগল।

শামী ছুটির পর প্রাইভেট পড়ে বাড়ী ফিরছিল। তার কাছে ছাতা ছিল। কিছু দূর আসার পর দূর থেকে একটা মেয়েকে ভিজে ভিজে যেতে দেখে পা চালিয়ে এগিয়ে এসে বুঝতে পারল, মেয়েটি ফাহমিদা। আরো দ্রুত পা চালিয়ে একদম কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, আপনি আমার ছাতাটা নিন।

ফাহমিদা সালামের উত্তর না দিয়ে শামীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, আমি তো ভিজেই গেছি। আমাকে ছাতা দিলে আপনিও ভিজে যাবেন।

শামী বলল, আমাদের বাড়ী কাছেই। এইটুকু পথ ভিজলে কিছু হবে না। আপনাকে অনেকটা পথ যেতে হবে। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ বিসুখ হতে পারে। নিন ধরুন।

ফাহমিদা বলল, তারচেয়ে দু'জনেই এক ছাতাতে যাই চলুন।

শামী আর কোন কথা না বলে দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। এক সময় বলল, আপনার নামটা বলবেন?

ঃ ফাহমিদা। আপনার?

ঃ শামী।

ঃ আপনি তো মাদ্রাসায় পড়তেন, স্কুলে পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না? শুনেছি আপনি ফার্স্ট হয়ে নাইনে উঠেছেন।

ঃ ঠিকই শুনেছেন। স্কুলে ভর্তি হবার কয়েক মাস আগে ফণিভূষণ স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ে কিছুটা কভার করে ছিলাম।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ তাই। আপনিও তো মেয়েদের স্কুলে ফার্স্ট হয়ে নাইনে উঠেছেন।

ঃ আমি তো প্রত্যেক বছরই ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠি।

আসলে তারা একে অপরকে চিনে। এমন কি উভয়ে উভয়ের ফ্যামিলীর সবকিছু জানে। তবু তারা মনের আবেগে একে অপরের কাছে নতুন করে পরিচিত হল।

তারপর তারা চুপ করে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পর শামী বলল, এবার আপনি ছাতাটি নিয়ে যান, আমাদের বাড়ীর কাছে এসে গেছি। তারপর নিজেই তার হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিল।

ফাহমিদা বলল, কিন্তু ফেরৎ দেব কি করে?

শামী বলল, আপনাদের চাকরের হাতে পাঠিয়ে দেবেন।

ফাহমিদার তখন খুব শীত করছে। সে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। এতক্ষণ

শামীর পাশাপাশি হেঁটে আসতে তার খুব ভাল লাগছিল। তখন শীত লাগলেও পাশাপাশি হাঁটার আনন্দে তা অনুভব করতে পারেনি। এক হাতে বই খাতা বুকে চেপে ধরে অন্য হাতে ছাতা ধরে হাঁটতে লাগল। বাড়ীতে এসে তাদের চাকরের হাতে ছাতাটা শামীদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল।

দুই

ফাহমিদার বাবা আবসার উদ্দিন বেশ পয়সাওয়ালা লোক। জমি জায়গা অনেক। বাড়ী ঘর সব পাকা। গ্রামে প্রতিপত্তিও আছে। উনার তিন ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলে কানাডায়। মেজ ছেলে লণ্ডনে। ছোট ছেলে হলে থেকে ঢাকা ভার্সির্টিতে পড়ছে। সবার ছোট ফাহমিদা। তাদের ফ্যামিলীর সবাই শিক্ষিত ও মডার্ন। ফাহমিদা এক মেয়ে, তার উপর সবার ছোট। তাই সে খুব আদরে মানুষ হচ্ছে।

সেদিন বাড়ীতে এসে ফাহমিদা শামীর কথা ভাবতে লাগল। সেও শুনেছিল, শামী মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে গ্রামের খারাপ ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। তখন তার সাথে পরিচয় না থাকলেও সে কথা শুনে ভেবেছিল, অমন আলেম লোকের ছেলে হয়ে খারাপ হয়ে গেল। তার এরকম ভাবার কারণ ছিল। ভাল ছেলে হিসাবে গ্রামে শামীর বেশ সুনাম ছিল। তারপর যে দিন রাহেলাও জোবেদার সাথে স্কুলে যাবার সময় শামী জামালকে তার কথা জিজ্ঞেস করে, সেদিন ফাহমিদা সেকথা শুনতে পেয়ে তার উপর খুব রেগে গিয়েছিল। পরে যখন শামী আড়াল থেকে তাকে দেখত তখন ফাহমিদা মনে মনে একটু আবশোষ করত এই কথা ভেবে যে, অত ভাল ছেলে হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিল। কিছুদিন পর তার চাচাতো ভাই হেমায়েতের মুখে শামী আবার স্কুলে পড়ছে শুনে মনে চমক খেয়েছিল। আজ এতটা পথ একসঙ্গে এসে এবং তার সঙ্গে কথা বলে ফাহমিদার তরুণী মনে কেমন যেন আনন্দ অনুভব হতে লাগল।

এরপর থেকে স্কুলে যাতায়াতের সময় তারা দেখা হলে সালাম বিনিময় করে। ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে, একে অন্যের পড়াশুনার খবর নেয়। নোট অদল বদল করে। যেদিন তার বান্ধবীরা সঙ্গে থাকে সেদিন কেউ কারো সাথে কথা বলে না। তবে চোরা চোখে দু'জন দু'জনকে দেখে।

ব্যাপারটা কিছু দিনের মধ্যে রাহেলা ও জোবেদা বুঝতে পারল। একদিন শামী পাশ কাটিয়ে চলে যাবার পর বান্ধবী রাহেলা ফাহমিদাকে বলল, কি ব্যাপার বলতো, শামী যেমন তোকে চোরা চোখে দেখে, তুইও তেমনি শামীকে চোরা চোখে দেখিস?

সাথে সাথে জোবেদা বলে উঠল, আমিও এর আগে কয়েকবার লক্ষ্য করেছি। মনে হচ্ছে, ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

এই কথায় তিন জনেই হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে ফাহমিদা বলল, তোদের কি মনে হয়?

রাহেলা বলল, কি আর মনে হবে? তবে তোদের দু'জনের মধ্যে যে কিছু একটার শিকড় গজাচ্ছে, তা হলফ করে বলতে পারি।

ফাহমিদা বলল, কিসের শিকড়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

জোবেদা বলল, অত আর ন্যাকামো করিসনি। ভাজা মাছ যেন উল্টে খেতে জানে না? রাহেলা বলতে না পারলেও আমি বলছি; তোদের মধ্যে ভালবাসার শিকড় গজাচ্ছে।

ফাহমিদা শুনে মনে মনে খুশী হলেও রাগ দেখিয়ে বলল, এবার আমি যদি বলি, তোরাই তাকে ভালবাসিস? ঐ যে কথায় বলে, "চোরের মন বোঁচকার দিকে"।

রাহেলা বলল, আমরাতো শামীর দিকে চোরা পথে তাকাইনি। আর সেও আমাদের দিকে তাকায়নি। তুই স্বীকার না করলেও আমাদের অনুমান সত্য।

ফাহমিদা কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

জোবেদা বলল, কিরে চুপ করে আছিস কেন? মনে হচ্ছে জোঁকের মুখে নুন পড়েছে।

ফাহমিদা রেগে দিয়ে বলল, যে মূলো খায়, তার ঢেকুর থেকে মূলোরই গন্ধ বেরোয়।

জোবেদা বলল, তা ঠিক কথা। তবে তুই যাই বলিস না কেন, রাহেলা যা বলল, তা সত্য সত্য সত্য।

ফাহমিদা রেগে ছিল। জোবেদাকে তিন সত্য খেতে দেখে রাগের সঙ্গেই বলল, তোদেরকে আর ওকালতি করতে হবে না। এবার বকবকানি থামা। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তোদের কাছে হার মানছি।

রাহেলা বলল, ধরা যখন পড়েই গেলি তখন আর আমাদের কাছে কোন কিছু গোপন করিসনি। কিরে চিঠিপত্র দেয়া নেয়া হয়েছে নাকি? আমরা কথা দিচ্ছি, তোদের সবকিছু গোপন রাখব। দরকার হলে তোদেরকে সাহায্য করব।

ফাহমিদা হেসে ফেলে বলল, তোরা কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছিস। ঐ যে লোকে বলে, "যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।" তোদের হয়েছে সেই দশা। তোদের অনুমান কতটা সত্য জানি না। তবে এখনো চিঠি দেয়া নেয়া হয়নি।

জোবেদা বলল, সত্যি বলছিস?

ফাহমিদা বলল, সত্যি সত্যি সত্যি। হল তো?

জোবেদা বলল, আজ রাতেই একটা চিঠি লিখবি। তুই নিজে দিতে না পারলে আমি দেব।

রাহেলা বলল, জোবেদা ঠিক কথা বলেছে। চিঠি লিখে কাল স্কুলে নিয়ে আসবি। আমরাও পড়ব। আমাদের আবার যদি কোন দিন কাউকে চিঠি দিতে হয়। তাই আগে থেকে শিখে রাখব। কিরে দেখাবি তো?

ফাহমিদা মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলল, আমি যেন কত প্রেম পত্র লিখেছি।

রাহেলা বলল, লিখিস নি তো কি হয়েছে? কেউ কি মায়ের পেট থেকে সব কিছু শিখে আসে? দরকার মত সবাইকে সবকিছু শিখে নিতে হয়।

ফাহমিদা বলল, সে যদি আমার চিঠির উত্তর না দেয়? অথবা আমাকে বেহায়া মেয়ে ভেবে যা তা লিখে উত্তর দেয় তখন কি হবে? অপমান তো আমি হব; তোরা তো হবি না।

জোবেদা বলল, শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়। শামীর সঙ্গে এতবার দেখা হয়, কিন্তু একবারও আমার মুখের দিকে তাকায় না। অথচ তোর দিকে তাকায়।

জোবেদাকে থামিয়ে দিয়ে রাহেলা বলল, তোর কথা কারেক্ট। গ্রামের ছেলে সবারই সাথে প্রায় দেখা হবে। আমারও সাথে অনেকবার দেখা হয়েছে। আমার সঙ্গেও কোন কথা বলে না। সামনা সামনি হলে মাথানিচু করে চলে যায়। আমিও বলছি, তুই চিঠি দিয়ে দেখ, আমাদের কথা সত্য না মিথ্যা।

তাদের কথা শুনে ফাহমিদা মনে মনে গর্ব অনুভব করল। সেই সঙ্গে আনন্দও কম হল না। তবু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিক আছে, তোরা যখন এত করে বলছিস তখন একটা চিঠি না হয় দেব। কিন্তু যদি উল্টো এ্যাকশন হয়, তাহলে তোদেরকে আস্ত রাখব না।

রাহেলা বলল, তা না হয় না রাখলি। আর যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে মিষ্টি খাওয়াবি বল?

ফাহমিদা বলল, খাওয়াব।

ততক্ষণে ওরা বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে। সালাম বিনিময় করে যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যের পর ফাহমিদা কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারল না। শুধু রাহেলা ও জোবেদার কথা মনে পড়তে লাগল। শেষে কাগজ কলম নিয়ে শামীকে চিঠি লিখতে বসল। কিন্তু কিভাবে শুরু করবে এবং কি লিখবে ঠিক করতে না পেরে কাগজের উপর কলম ধরে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগল। সে বড় ও মেজ ভাইকে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে নিজের জন্য এটা সেটা পাঠাতে বলে। তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে কোন দিন চিঠি লিখেনি। এখন ভালবাসার পাত্রকে কিভাবে মনের কথা লিখবে ভেবে পেল না। অনেকক্ষণ চিন্তা করে লিখতে শুরু করল।

শামী ভাই,

প্রথমে আমার সালাম নেবেন। পরে জানাই যে, কিশোর বয়সে আব্বা-আম্মার মুখে আপনার সুনাম শুনতাম। একটু বড় হবার পর আপনাকে দেখতে ইচ্ছা হত। তাই সাথীদের নিয়ে আপনাদের পাড়াতে মাঝে মাঝে ঘুরতে যেতাম। কখনো দেখতে পেতাম, আবার কখনো পেতাম না। তারপর যখন শুনলাম আপনি মাদ্রাসার পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আজে বাজে ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান তখন মনে একটু দুঃখ পেয়েছিলাম। পরে আবার যখন শুনলাম, স্কুলে ভর্তি হয়েছেন তখন খুশী হলাম। কেন যে ঐরকম হত তখন বুঝতে পারতাম না। গত বছর বর্ষার সময় যেদিন আমি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরছিলাম, সেই দিন হঠাৎ আপনি এসে আমাকে ছাতা দিতে চাইলে আমি আগের থেকে অনেক বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম।

তাই সবকিছু জেনেও আপনাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করি। তারপর থেকে আপনি সব সময় আমার চোখে ও মনে ভেসে বেড়াচ্ছেন। স্বপ্নেও আপনাকে সব সময় দেখি। আপনাকে বাস্তবে বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। মাঝে মধ্যে স্কুলের পথে হঠাৎ এক-আধদিন অল্প সময়ের জন্য একাকি দেখা হলে কথা বলি। কিন্তু তাতে আমার মনের আশা মিটেনা। ইচ্ছে করে সারাদিনরাত আপনার পাশে বসে গল্প করি। সে আশা কবে পূরণ হবে জানিনা। যেদিন বান্ধবীরা আমার সঙ্গে থাকে সেদিন আপনাকে পাশ কেটে যেতে দেখে চোরা চাহনিতে দেখি। এর কারণ কি বলতে পারেন? আমার তো মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে মন প্রাণ উজাড় করে ভালবেসে ফেলেছি। মেয়ে হয়েও মনের তাগিদে নির্লজ্জের মত বলে ফেললাম। আমার বিশ্বাস, আপনিও আমাকে ভালবাসেন। সেই বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে এই পত্র লিখলাম। যদি এটা আমার অন্যায় হয়, তবে ক্ষমা করে দেবেন। আর ব্যাপারটা দয়া করে কাউকে জানাবেন না। নচেৎ আমি কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন পথ থাকবে না। কোন দিন কাউকে চিঠি লিখিনি। কেমন করে লিখতে হয় তাও জানিনি। ভুলত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন। আর একবার আপনাকে সালাম জানিয়ে শেষ করছি।

—ইতি
ফাহমিদা

[বিঃদ্রঃ উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।]

পরের দিন তিন বান্ধবী স্কুলে যাবার পথে জোবেদা ফাহমিদাকে জিজ্ঞেস করল, কি রে চিঠি লিখেছিস?

ফাহমিদা অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ, লিখেছি।

জোবেদা বলল, কই জলদি বের কর।

ফাহমিদা একটা বইয়ের ভিতর থেকে মুখ খোলা রঙ্গিন খাম বের করল।

জোবেদার আগে রাহেলা ছোঁমেরে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, আমি পড়ছি। সে জোরে জোরে চিঠিটা পড়ে ভাঁজ করে খামের ভিতর পুরে ফাহমিদার হাতে ফেরৎ দেবার সময় বলল, কি আমাদের কথা ঠিক হল? অনেক দিন থেকে তাহলে ডুবে ডুবে পানি খাওয়া হচ্ছে? আমরা বাজীতে জিতবই।

ফাহমিদা বলল, বাজী তো আমাকে নিয়ে হয়নি, শামীকে নিয়ে হয়েছে। চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বাজীর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আর এতে ডুবে ডুবে পানি খাবার কি হল? একজনের দ্বারা তো তা সম্ভব নয়।

জোবেদা বলল, আজ চিঠিটা দে। কাল নিশ্চয় ফলাফল পাওয়া যাবে। তখন বোঝা যাবে, ডুবে ডুবে পানি খাচ্ছ কিনা। কিরে চিঠিটা তুই দিবি? না আমরা কেউ দেব?

ফাহমিদা বলার আগে রাহেলা বলে উঠল, আমরা কেউ দিতে যাব কেন? যারটা তারই দেয়া ভাল।

ফাহমিদা চুপ করে রইল।

জোবেদা বলল, তুই ঠিক কথা বলেছিস। তারপর তারা যুক্তিকরে ঠিক করল, ছুটির পর শামীর জন্য সবাই মিলে রাস্তায় অপেক্ষা করবে। তাকে আসতে দেখলে রাহেলা ও জোবেদা লুকিয়ে পড়বে। ফাহমিদা চিঠি দেবার পর তারা তাদের কাছে আসবে।

সেদিন ছুটির পরে ফেরার পথে কিছু দূর আসার পর রাস্তার ধারে পালেদের বড় পুকুরের পাড়ে বসে তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

শামী ছুটির পর প্রাইভেট পড়ে বাড়ী ফিরছিল। পালেদের পুকুরের কাছে এসে ফাহমিদাকে একাকি একটা পেয়ারা গাছতলায় বসে থাকতে দেখে সালাম দিয়ে আতংকিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে? এখানে বসে আছেন কেন?

ফাহমিদা সালামের উত্তর দিয়ে হাসিমুখে বলল, না, শরীর খারাপ লাগছে না। আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। আসুন এখানে, আরো একটু বসা যাক।

শামী তার কথা শুনে আনন্দিত হয়ে ফাহমিদার পাশে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ফাহমিদাও শামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কতক্ষণ যে তারা ঐভাবে ছিল তা জানতে পারল না। এক সময় ফাহমিদা দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, এতক্ষণ ধরে কি দেখছেন?

শামী বাস্তবে ছিল না, ফাহমিদার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, আপনাকে।

ফাহমিদা লজ্জারাঙ্গা হয়ে বলল, আগেও তো দেখেছেন?

ঃ এত কাছ থেকে এভাবে কোন দিন দেখিনি। এবার বলুন, অপেক্ষা করছিলেন কেন?

ঃ আপনি আমাকে আপনি করে বলছেন কেন? আমি তো আপনার চেয়ে ছোট। আমরা তো একই গ্রামের ছেলেমেয়ে।

ঃ তাই যদি বলেন, তাহলে আপনিও কেন আমাকে আপনি করে বলছেন?

ঃ আপনি আমার থেকে বড়। বড়কে আপনি করে বলাই তো উচিত।

ঃ তা অবশ্য উচিত। তবে সবক্ষেত্রে নয়। এবার থেকে আমরা কেউ কাউকে আপনি করে আর বলব না, কেমন?

ফাহমিদা মাথা নিচু করে বলল, তাই হবে।

শামী বলল, কেন অপেক্ষা করছিলে বলবে না?

ফাহমিদা চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বলল। এই জন্যে।

শামী চিঠি নেবার সময় তার হাত ধরে রেখে বলল, এটাতে কি আছে জানি না। তবু বলছি, এটার জন্য বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহ পাক সেই আশা আজ পূরণ করলেন। সেজন্যে তাঁর পাক দরবারে জানাই হাজার হাজার শুকরিয়া। শামী ফাহমিদার হাত ধরে রাখতে সে ভয়মিশ্রিত লজ্জায় কাঁপছিল। তা বুঝতে পেরে শামী তার হাত ছেড়ে দিল।

শামীকে আসতে দেখে রাহেলা ও জোবেদা অনতিদূরে একটা বড় আমগাছের

আড়ালে লুকিয়ে পড়ছিল। তারা এতক্ষণ তাদের ক্রিয়াকলাপ দেখছিল ও শুনছিল। এবার তারা এগিয়ে এসে একসঙ্গে শামীকে সালাম দিল।

শামী একটু ঘাবড়ে গিয়ে সালামের উত্তর দিয়ে আমতা আমতা করে বলল, তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

রাহেলা হাত বাড়িয়ে আম গাছটা দেখিয়ে বলল, ওটার আড়ালে।

জোবেদা বলল, শামী ভাই, আমরা কিন্তু আপনাদের সব কথা শুনেছি। কিছু মাইণ্ড করেননি তো?

তাদের কথা শুনে শামীর ভয় কেটে গেল। বুঝতে পারল, ফাহমিদা যে আমাকে চিঠি দেবে তা তারা জানে। বলল, মাইণ্ড করার কি আছে। চল এবার এক সঙ্গে যাওয়া যাক।

জোবেদা বলল, আপনি যান, আমরা একটু পরে আসছি।

ঠিক আছে তাই এস বলে শামী তাদের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

শামী চলে যাবার পর রাহেলা ফাহমিদাকে বলল, কিরে শামী ভাইকে কেমন বুঝলি? তোদের কথাবার্তা শুনে তো মন হল দু'জনেই ফেঁসে গেছিস? ফাহমিদা লজ্জা পেয়ে বলল, হয়তো তোদের কথা ঠিক। তবে চিঠির উত্তর পেলে সিওর হওয়া যাবে। এখন চল বাড়ী যাই।

শামী বাড়ীতে এসে বই খাতা রেখে ফাহমিদার চিঠিটা পড়ে উত্তর লিখতে বসল।

প্রিয়তমা,

প্রথমে আমার আন্তরিক ভালবাসা নিয়ে আমাকে ধন্য করো। পরে জানাই যে, পত্র পড়ে আমি যে কত আনন্দিত হয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না, চাতক পাখিরা তৃষ্ণার্ত হয়ে এক ফোটা বৃষ্টির আশায় যেমন আকাশের দিকে চেয়ে থাকে তেমনি আমিও অনেক দিন থেকে তোমার চিঠির আশায় অপেক্ষো করছিলাম। মরুদ্যানে পথিকরা বিশ্রাম নেবার সময় বৃষ্টি হলে তারা যেমন তৃপ্ত হয়, তোমার চিঠি পেয়ে আমিও সেইরূপ তৃপ্তি পেলাম। কিশোর বয়সে তোমাকে দেখে আমিও এক রকমের আনন্দ পেতাম। তারপর যত বড় হয়েছি, তোমাকে দেখে আরো বেশি আনন্দ পেয়েছি। যখন শয়তানের প্ররোচনায় পড়াশুনা ছেড়ে দিই তখন একদিন রাহেলা ও জোবেদার সঙ্গে তোমাকে স্কুলে যেতে দেখে সেই পুরোনো আনন্দ আবার মনের মধ্যে অনুভব করি। সেইদিন থেকে আমার মন আমাকে বলতে লাগল, তুমি যে ফাহমিদাকে দেখে এত আনন্দ পাও, তার কারণ চিন্তা করে দেখছ? এর কারণ হল, তুমি তাকে ভালবাস। তাকে পেতে হলে তোমাকে লেখাপড়া করে মানুষের মত মানুষ হতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, স্কুলে লেখাপড়া করব। তারপর আব্বা-আম্মাকে রাজি করিয়ে স্কুলে ভর্তি হলাম। স্কুলে ভর্তি হবার প্রায় দেড় বছর পর এক বর্ষার দিনে আল্লাহ পাক তোমার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে ধন্য করলেন। সেই থেকে তোমার কাছ থেকে এই রকম একটা চিঠি পাবার আশা করছিলাম। সেই আশাও আল্লাহ পাক পূরণ করলেন। সেজন্য তাঁর পাক দরবারে

জানাচ্ছি লাখো শুকরিয়া। ফাহমিদা তোমাকে আমি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসি। সেই ভালবাসা আমাকে পড়াশুনা করে মানুষ হবার প্রেরণা যুগিয়েছে। মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে এবং দেখা দিয়ে সুখী করো। তোমাকে একান্ত করে পাওয়াই আমার জীবনের একমাত্র কামনা। তবে আমাকে তোমার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। পারবে না ফাহমিদা অপেক্ষা করতে? আমার মন বলছে পারবে। অনেক কিছু লিখতে মন চাচ্ছে; কিন্তু তোমার পত্র পেয়ে মনের মধ্যে আনন্দের স্রোত এত বেশী বইছে যে, তার স্রোতে সেগুলো তৃণখণ্ডের মত ভেসে যাচ্ছে। তোমার পত্রের উত্তর পাবার পর সেইসব কথা লিখব। এখন আল্লাহ পাকের কাছে তোমার সহি সালামতের জন্য দোয়া করে শেষ করছি। 'আল্লাহ হাফেজ।

—ইতি

শামী

শামী ফাস্ট বেঞ্চে বসার জন্য প্রতিদিন ফাহমিদাদের আগে স্কুলে রওয়ানা দেয়। আজ পালেদের পুকুর পাড়ের কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর ফাহমিদা, জোবেদা ও রাহেলা সেখানে এলে শামী সালাম দিয়ে বলল, তোমরা কেমন আছ?

রাহেলা সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আমরা তো ভাল আছি শামী ভাই; কিন্তু ফাহমিদার কথা বলতে পারছি না। তারপর জোবেদাকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলরে জোবেদা, আমরা আস্তে আস্তে এগোই। ফাহমিদাই বলুক, ও কেমন আছে। তারপর তারা স্কুলের দিকে হাঁটতে লাগল।

ওরা একটু এগিয়ে যেতে শামী ফাহমিদার হাতে চিঠিটা দিয়ে বলল, পড়ে উত্তর দিবে কিন্তু। কেমন আছ বললে না যে?

ফাহমিদা চিঠিটা বুকের কাছে ব্লাউজের ভিতর রেখে বলল, চিঠি পড়ে তুমি কি ভাববে মনে করে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি।

শামী বলল, আমি কিন্তু তোমার মনের কথা জানতে পেরে খুব শান্তির সঙ্গে ঘুমিয়েছি। আমার চিঠি পড়লেই সবকিছু জানতে পারবে। এবার থেকে আমরা স্কুলে যাবার বা আসবার পথে এখানে দেখা করব। চল যেতে যেতে কথা বলি।

ফাহমিদা আর কিছু না বলে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল।

এরপর থেকে তারা মনের আনন্দে লেখাপড়া করতে লাগল। প্রতিদিন স্কুলে যাবার সময় পালেদের পুকুর পাড়ে এসে ফাহমিদা, রাহেলা ও জোবেদাকে স্কুলে চলে যেতে বলে সে শামীর জন্যে অপেক্ষা করে। শামী আসার পর দু'জনে গল্প করতে করতে স্কুলে যায়। কোন কোন দিন স্কুল কামাই করে বসে বসে গল্প করে আবার কোন দিন মুন্সীগঞ্জে বেড়াতে যায়। এতকিছু করলেও তারা পড়াশুনায় অবহেলা করল না। এভাবে দিন গড়িয়ে চলল। জোবেদা ও রাহেলা ছাড়া তাদের দু'জনের অভিসারের কথা কেউ জানতে পারল না। শুধু শামীর বন্ধু রায়হান সবকিছু জানে। শামী বন্ধুকে না জানিয়ে থাকতে পারেনি। ফাহমিদা যত চিঠি দেয় এবং সেও যত চিঠি ফাহমিদাকে দেয়, সেগুলো তো রায়হানকে দেখাবেই। এমন কি তার সঙ্গে

কি কথা হয় তাও বলে। প্রথম যেদিন শামী তাকে ফাহমিদার চিঠি দেখায়, সেদিন রায়হান বলেছিল, বড়লোকের মেয়েদের বিশ্বাস করা যায় না। আমার মনে হয় তুই ভুল করেছিস। শামী কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করেনি। বলেছিল, সবাই সমান হয় না। নাইন থেকে টেনে উঠার সময় দু'জনেই ফাস্ট হল। রেজাল্টের দিন শামী তিনজনকে বাজারে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খাওয়াল।

খাওয়া শেষে জোবেদা ফাহমিদাকে বলল, কিরে শামী ভাইকে প্রথম চিঠি দেবার আগে আমাদের সঙ্গে কি বাজী রেখেছিলি, তা ভুলে গেছিস না কি?

ফাহমিদা বলল, ভুলব কেন? এতদিন তোরা সেকথা বলিস নি কেন?

শামী জিজ্ঞেস করল, কিসের বাজী?

ফাহমিদা হাসতে হাসতে ঘটনাটা বলল।

শামী বলল, ফাহমিদা তোমাদেরকে মিষ্টি না খাইয়ে ভালই করেছে। তখন খাওয়ালে আমি ফাঁকা পড়ে যেতাম। এখন হয়ে যাক তাহলে।

রাহেলা বলল, আপনি যা খাইয়েছেন তাতেই পেট টৈটুম্বুর হয়ে গেছে। এখন আর কিছু খেতে পারব না। অন্যদিন ফাহমিদার কল্লা মটকাব।

রাহেলার কথা শুনে তিনজনে হাসতে লাগল। ফাঁহমিদা হাসি থামিয়ে বলল, তুই এমন কথা বলিস, হাসি চেপে রাখা যায় না। এবার চল বাড়ী ফেরা যাক। নচেৎ বেশি দেরী করলে সবাই চিন্তা করবে।

সেদিন শামী বাড়ী ফেরার পথে রায়হানকে রেজাল্টের কথা জানিয়ে এল।

তিন

ক্লাস টেনের প্রিটেস্টের আগে পর্যন্ত তাদের প্রেমের পথে কোন বাধা আসল না। কিন্তু প্রিটেস্টের পরে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফাহমিদার বাবা তাদের দু'জনের সম্পর্ক জানতে পেরে তিনি মেয়েকে ভীষণ রাগারাগি করলেন। তারপর থেকে মেয়ের উপর খুব কড়া নজর রাখলেন। ফলে ফাহমিদা শামীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল। ঘটনাটা হল, সেদিন ফাহমিদা চিঠি লিখে একটা বইয়ের ভিতরে রেখে বইটা তাদের চাকর রফিকের হাতে দিয়ে বলল, এটা শামীকে দিয়ে অপেক্ষা করবি। তারপর সে একটা বই তোর হাতে দিবে। সেটা নিয়ে আমাকে দিবি। রফিকের বয়স বার-তেরর মতো। তাকে ছয় বছরের রেখে তার বাবা মারা গেছে। তার মা আবার বিয়ে করেছে। দ্বিতীয় স্বামীর ঘরের কেউ রফিককে দেখতে পারে না। ছোট ছেলে, একটু কিছু করলে সবাই মারে। শেষে তার মা সাত বছরের রফিককে আবসার উদ্দিনের কাছে কান্নাকাটি করে রেখে গেছে। একই গ্রামের মেয়ে রফিকের মা। তাই তিনি দয়াপরবশ হয়ে রফিককে ঘরের ফাইফরমাস শোনার জন্য রেখে দেন। আজ সাত বছর রফিক আবসার উদ্দিনের কাছে আছে। ফাহমিদার চেয়ে রফিক দু'তিন বছরের ছোট। সে তারই ফরমাস বেশী শুনে। আজকের আগে ও কয়েকবার ফাহমিদা তাকে দিয়ে ঐভাবে শামীকে চিঠি দিয়েছে। কারণ সবদিন পালেদের পুকুর

পাড়ে শামীর সঙ্গে তার দেখা হতনা। কয়েক দিন দেখা না হতে তাই আজ রফিকের হাতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বিধি হল বাম। রফিক শামীর কাছ থেকে ফিরে এসে আবসার উদ্দিনের সামনে পড়ে গেল।

আবসার উদ্দিন রফিককে বাইরে থেকে বই হাতে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোর হাতে কি বই দেখি?

রফিক সাদাসিধে ছেলে। সে ফাহমিদা ও শামীর সম্পর্কের কথা কিছুই জানে না। নিশ্চিন্তে বইটা উনার হাতে দেবার সময় বলল, আপা একটা বই দিয়ে আমাকে বলল, এটা শামী ভাইকে দিবি, আর শামী ভাই যে বইটা দেবে সেটা নিয়ে আসবি।

আবসার উদ্দিন ততক্ষণ বইটা নিয়ে বইয়ের উপর শামীর নাম ঠিকানা লেখা দেখে উনার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। এক সময় বইটার পাতা উল্টাতে গিয়ে শামীর দেয়া চিঠি পেয়ে গেলেন। চিঠি পড়ে উনার মাথা গরম হয়ে গেল। হুংকার দিয়ে মেয়েকে ডাক দিলেন।

ফাহমিদা নিজের রুমে বসে বসে রফিকের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আব্বার হুংকার শুনে ভয় পেয়ে গেল। কারণ তার আব্বা তাকে কোন দিন কড়া মেজাজে কথা বলেনি। রুম থেকে বেরিয়ে আব্বার হাতে বই ও চিঠি দেখে এবং রফিককে সেখানে দেখে আরো ভয় পেল। চিন্তা করল, চিঠি পড়ে আব্বা নিশ্চয় সবকিছু জেনে ফেলেছে।

তাকে দেখে আবসার উদ্দিন চিঠিটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে দু'হাতে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, শামীকে তুই এভাবে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দে। তুই এখন ছেলে মানুষ। প্রেম ভালবাসার কি বুঝিস? শামী খুব খারাপ ছেলে। তাছাড়া তার বাবা গরীব। তার উপর মোল্লা। মোল্লাকী করে কোন উপায়ে সংসার চালায়। তাদের কি আছে? না আছে টাকা পয়সা, না আছে বংশ মর্যাদা। যেভাবে তুই মানুষ হচ্ছিস, তাতে করে ওদের বাড়ীতে গিয়ে চিরজীবন দুঃখে ভাসবি। একদণ্ড সুখে থাকতে পারবি না। আমাদের বংশের একটা সম্মান আছে। এসব কথা লোকে শুনলে, সেই সম্মান ধূলোয় মিশে যাবে। আমি তোর বাবা। প্রত্যেক বাবা তার সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। আমার শেষ কথা শুনে রাখ, এরপরও যদি তুই শামীর সাথে যোগাযোগ রাখিস, তাহলে জ্যান্ত কবর দিয়ে দেব। যা এবার মন দিয়ে পড়াশুনা কর। সামনে তোর পরীক্ষা।

ফাহমিদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। সেইভাবে নিজের রুমে চলে গেল। তারপর থেকে সে আর শামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহস করল না।

ফাহমিদা যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে শামী খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। প্রিটেস্ট পরীক্ষার মাস খানেক পর থাকতে না পেরে একদিন জোবেদাদের বাড়ী গেল।

জোবেদা তাকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, আরে শামী ভাই যে, আসুন বসুন।

শামী সালামের উত্তর দিয়ে বলল, তুমি আমার একটা উপকার করবে?

জোবেদা বলল, একটা কেন হাজারটা করব। দারকার হলে প্রাণও বাজী রাখব। আপাততঃ দু'মিনিট অপেক্ষা করুন, আসছি বলে সেখান থেকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একহাতে একটা প্লেটে দুটো সিদ্ধ ডিম ও এক কাপ চা আর অন্য হাতে এক

গ্লাস পানি নিয়ে এসে টেবিলের উপর রেখে বলল, প্রথমে এগুলোর সদ্ব্যবহার করুন, তারপর কি করতে হবে শুনবো।

শামী বলল, তুমি এসব করতে গেলে কেন? আমি কি মেহমান নাকি? জোবেদা একটা ছোট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, যদি বলি আপনি তার থেকেও অনেক বেশি। তারপর হেসে উঠে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলুন; নচেৎ আপনার কোন উপকার করতে পারব না।

শামী জোবেদার কথার মধ্যে যেন অন্য সুর রয়েছে বুঝতে পারল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। তখন তার মন ফাহমিদাকে দেখার জন্য উতলা হয়ে আছে। তাই একটা ডিম খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, ফাহমিদাকে একটু ডেকে আনতে পার?

জোবেদা বলল, কেন পারব না। আপনি চা খাওয়া শেষ করুন আমি ততক্ষণে ওকে ডেকে নিয়ে আসছি। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

তাদের বাড়ী থেকে অল্প কিছু দূরে ফাহমিদাদের বাড়ী। ফাহমিদা ঘরে ছিল, জোবেদাকে দেখে বলল, কিরে হঠাৎ কি মনে করে?

জোবেদা বলল, শামী ভাই আমাদের সদরে বসে আছেন। তোকে ডাকছেন।

ফাহমিদা বলল, আব্বা ঘরে আছে। এখন যেতে পারব না। তুই শামী ভাইকে বলবি, সে যেন এদিকে না আসে। আমি পরে তার সাথে যোগাযোগ করব।

জোবেদা বলল, মনে হচ্ছে, শামী ভাইয়ের সঙ্গে তোর অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তাই এসেছে। তোর আব্বা আছে তো কি হয়েছে? সে তো আর জানবে না, তুই শামী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস?

ফাহমিদা একটু চিন্তা করে বলল, তোকে সব কথা এখন বলা যাবে না। শামী ভাইকে যা বলতে বললাম গিয়ে তাই বল।

জোবেদা মুখ ভার করে ফিরে এসে ফাহমিদা যা বলে দিয়েছিল তা বলল।

শুনে শামীর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, কি আর করা যাবে, চলি তাহলে। তারপর সালাম বিনিময় করে ফিরে এল।

দেখতে দেখতে টেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেল। আজ রেজাল্ট দেবে। শামী পালেদের পুকুর পাড়ে এসে অনেকক্ষণ ফাহমিদার জন্য অপেক্ষা করল। কিন্তু ফাহমিদা এল না। ভাবল, সে হয়তো আমি আসবার আগে স্কুলে চলে গেছে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্কুলে রওয়ানা দিল। স্কুলে পৌঁছে রেজাল্ট দেখার জন্য নোটিস বোর্ডের কাছে এগিয়ে যেতে চার পাঁচজন সহপাঠি শামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, শামী ভাই তুমি ফার্ষ্ট হয়েছ।

শামী শোকর আল হামদুলিল্লাহ বলে বলল, তোমরাও নিশ্চয় এলাউ হয়েছ? তারা সবাই বলে উঠল, হ্যাঁ শামী ভাই আল্লাহ পাকের রহমতে আমরাও এলাউ হয়েছি।

শামী তবু নোটিস বোর্ডের কাছে গিয়ে এক নাম্বারে তার নাম দেখে ভীষণ আনন্দ অনুভব করল। তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েদের স্কুলে গেল।

ছেলেদের স্কুল থেকে মেয়েদের স্কুল পাঁচ-ছ মিনিটের পথ। শামী এসে

ফাহমিদাকে খুঁজতে লাগল। নোটিস বোর্ডের কাছে না পেয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বারান্দার শেষ মাথায় তাকে একাকি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। শামী নোটিস বোর্ডে দেখল, ফাহমিদাও ফার্স্ট হয়েছে। তবুও তাকে একাকি মন ভার করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, তুমি এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? তোমার চেহারাই বা এত মলিন কেন? আজ তোমাকে এরকম দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি।

ফাহমিদা কোন কথা না বলে উদাস দৃষ্টিতে শামীর দিকে চেয়ে রইল।

তাই দেখে শামী বলল, কি হয়েছে বল ফাহমিদা। তোমার এই নীরবতা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। এতদিন ডুব মেরেই বা ছিলে কেন? জান, আমি ফার্স্ট হয়েছি? ফাহমিদা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, জানতাম, তুমি ফার্স্ট হবেই।

ঃ তুমিও তো ফার্স্ট হয়েছ; তবু তুমি মন খারাপ করে রয়েছ কেন? এদিকে আমি প্রতিদিন পালদের পুকুর পাড়ে তোমার অপেক্ষায় থেকেছি। আজও অনেকক্ষণ ছিলাম। চল তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব। আমি ফার্স্ট হয়েছি, তুমি খুশী হওনি?

ঃ খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে পারব না।

ঃ কেন?

ঃ ফাহমিদা কি ভাবে আব্বার কথাটা বলবে, চুপ করে ভাবতে লাগল।

ঃ কি হল চুপ করে রয়েছ কেন? আমরা দু'জনেই ফার্স্ট হয়েছি। আজ কি আনন্দের দিন। তোমার কোন কথা শুনব না। চল মিষ্টি খেয়ে সারাদিন দু'জনে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করে কাটাব।

ঃ বললাম না আজ কোথাও যেতে পারব না।

ঃ কিন্তু কেন বলবে তো?

ঃ আমাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা আব্বা জানতে পেরেছে। জানার পর আমাকে ভীষণ রাগারাগি করেছে। আর যেন তোমার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ না করি, সে কথা বলে বলেছে, যদি তার কথা না শুনি, তাহলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। আব্বার কথা এখন থাক। একটা কথা বলব, তোমাকে তা রাখতেই হবে। তুমি যদি সত্যিকার আমাকে ভালবেসে থাক, তাহলে তোমাকে একটা ওয়াদা করতে হবে।

শামী বলল, আমি তোমাকে সত্যিকার ভালবাসি কিনা তা আল্লাহ পাক জানেন। আর তুমি যদি শুনতে চাও, তাহলে বলছি শুন, তোমাকে অনেক দিন থেকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি এবং চিরকাল বেসে যাব। আমার ভালবাসার মধ্যে কোন মোহ বা স্বার্থ নেই। যদি আল্লাহ পাক তোমার সঙ্গে আমার মিলন নাও করান, তবু তোমাকে মনে রেখে আমরণ কাটিয়ে দেব। অন্য কোন মেয়েকে এ হৃদয়ে স্থান দিতে পারব না। কারণ তুমি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে রয়েছ। সেখানে অন্য কারো স্থান নেই। এবার বল, কি ওয়াদা করতে হবে। প্রাণের বিনিময়েও তা আমি রক্ষা করব।

ফাহমিদা বলল, আমাদের মেলামেশা ফাইন্যাল পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে

হবে। আমি যতদিন না তোমাকে দেখা করার কথা বলব ততদিন তুমি আমার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না। যেহেতু আমি তোমাকে ভালবাসি সেহেতু তোমার ক্ষতি হোক আমি তা চাই না। তোমার সুখ-শান্তি আমার কামনা।

ঃ বেশ আমি ওয়াদা করলাম, তুমি যা বললে তা আমি পালন করব। এবার আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করব, রাখবে?

ঃ রাখব।

ঃ রফিকের হাতে মাঝে মাঝে চিঠি দিও।

ঃ তা একেবারেই অসম্ভব। কারণ শেষবারে যে চিঠিটা তুমি রফিকের হাতে দিয়েছিলে, সেটা আব্বার হাতে ধরা পড়েছে। তারপর কিভাবে কি হল এবং সেই চিঠি পড়ে আব্বা কি করলেন তা সব বলে বলল, এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, কেন এতদিন তোমার সাথে যোগাযোগ করিনি এবং আমার চেহারা এত মলিন কেন? আর সেই জন্যেই জোবেদাদের বাড়ীতে যেদিন তুমি তার হাতে ডেকে পাঠিয়েছিলে সেদিন আসতে পারিনি।

শামী বলল, ঠিক আছে, আর বেশি কিছু তোমাকে বলতে হবে না। তুমি খবর না দেয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব না। তারপর ভিজে গলায় বলল, একটা কথা মনে রেখ, তোমাকে পাবার জন্য আমি সারাজীবন অপেক্ষা করব। এখন আসি তা হলে, আল্লাহ হাফেজ বলে সালাম বিনিময় করে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

ফাহমিদা তার দিকে চেয়ে রইল। শামী যখন স্কুলের গেটের বাইরে চলে গেল তখন গুটি গুটি পায়ে সেও গেটের দিকে এগোল।

রাহেলা-জোবেদাও টেস্টে এলাউ হয়েছে। তারা ফাহমিদাকে খুঁজতে গিয়ে তাকে শামী ভাইয়ের সাথে কথা বলতে দেখে গেটের বাইরে এসে অপেক্ষা করছিল। ফাহমিদা এলে রাহেলা বলল, কিরে শামী ভাইকে একা ছেড়ে দিলি যে? সে ফার্স্ট হয়েছে শুনে মিষ্টি খাওয়াতে বললাম। শামী ভাই অন্যদিন খাওয়াবে বলে চলে গেলেন। তার মন খুব খারাপ দেখলাম। এখন দেখছি তোরও মন খারাপ। কি ব্যাপার বলতো?

ফাহমিদা বলল, আমাদের ব্যাপারটা আব্বা জেনে গিয়ে আমার উপর যে ভীষণ রাগারাগি করেছে তা তোদেরকে একদিন বলেছিলাম। আজ শামীকে সেকথা জানিয়ে বললাম, এখন কিছুদিন যেন সে আমার সাথে যোগাযোগ না করে।

জোবেদা বলল, শামী ভাই কি বললেন?

ফাহমিদা বলল, কি আর বলবে? সেও তাই বলল। এবার এসব কথা থাক, চল বাড়ী যাই চল।

শামী ফাহমিদাদের স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে ফেরার পথে বন্ধু রায়হানের কাছে গেল।

রায়হান তাকে দেখে সালাম ও কুশল বিনিময় করে বলল, তোদের আজ টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার কথা না? তোর মুখ অত মলিন কেন? রেজাল্ট কি ভাল হয়নি?

শামী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, পরীক্ষার রেজাল্ট আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল হয়েছে। তারপর ফাহমিদা যা বলেছে তা এবং তার ওয়াদা করার কথা বলল।

কিছুদিন আগে রায়হান তার প্রাইভেট মাস্টারের কাছে ফাহমিদার বিয়ের কথা শুনেছে। ফাহমিদার ছোট খালা খালু এসে বৌ করবে বলে কথাবার্তা পাকা করে গেছেন। উনাদের ছেলের নাম মালেক। সে আমেরিকায় চাকরি করে। দেশে এলেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। রায়হান যে মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়ে, ফাহমিদাও সেই সেই মাস্টারের কাছে প্রাইভেট পড়ে। ফাহমিদাকে পড়াতে গিয়ে তিনি একদিন আবসার উদ্দিনের কাছে শুনেছিলেন। সে কথা শোনার পর রায়হান চিন্তা করেছে, কথাটা শামীকে জানাবে কিনা। তার একমন বলল, জানান উচিত। আবার একমন বলল, শামী শুনে খুব দুঃখ পাবে। তার চেয়ে সে নিজে একদিন না একদিন জানতে পারবে। এসব কথা তো আর গোপন থাকে না। তাছাড়া ফাহমিদাও যখন ব্যাপারটা জানে তখন সেও হয়তো শামীকে জানাতে পারে। আগে বেড়ে কথাটা না বলাই ভাল। আমার কাছে শুনে যদি শামী ভাবে, আমি তার দুষমণি করছি। এইসব ভেবে রায়হান শামীকে জানায়নি।

এখন শামীর কথা শনে রায়হানের ফাহমিদার বিয়ের কথা মনে পড়ল। বলল, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তোর মন এত খারাপ কেন?

ঃ ফামিদাকে আবার কবে দেখতে পাব ভেবে মন খারাপ হয়ে আছে।

ঃ দেখিস, শেষকালে তোকে ফাঁকি দিয়ে অন্যের গলায় ঝুলে না পড়ে।

ঃ তা কখনই সম্ভব নয়। আমাদের ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, তাহলে ফাহমিদা এটা জান গেলেও করতে পারবে না।

ঃ তোর ভালবাসা না হয় খাঁটি; কিন্তু ফাহমিদার যদি খাঁটি না হয়?

ঃ আমার যতদূর মনে হয়, তার ভালবাসাও খাঁটি। আর যদি তার ভালবাসায় খাদ থাকে, তবে আমার ভালবাসার আগুনে সেই খাদ পুড়িয়ে খাটি করে নেব।

রায়হান মনে মনে ভাবল, শামী ফাহমিদার বিয়ের কথা শুনলে কি করবে কি জানি। বলল, দোওয়া করি আল্লাহ পাক তোর মনের আশা পূরণ করুক। মন খারাপ করে আর কি করবি? ওয়াদা যখন করেছিস তখনতো তোকে তা রক্ষা করতেই হবে। ফাইন্যাল পরীক্ষার পর কি করে দেখ।

শামী বলল, তা তো নিশ্চয়। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

এরপর শামী মন দিয়ে পড়াশুনা করে ভালভাবে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার পর যত দিন যেতে লাগল তত ফাহমিদার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার মন ছটফট করতে লাগল। তবু ওয়াদা ভঙ্গের ভয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ না করে ধৈর্য ধরে তার চিঠির অপেক্ষায় রইল।

এভাবে তিন-চার মাস অতিবাহিত হবার পরও ফাহমিদা যোগাযোগ করল না। এর মধ্যে এস. এস. সি. পরীক্ষা. রেজাল্টও বেরিয়ে গেল। শামী চারটে লেটার

নিয়ে স্টার মার্ক পেয়ে ফার্স্ট ডিভিসানে পাস করেছে। রেজাল্ট বেরোবার পর থাকতে না পেরে একদিন শামী জোবেদাদের বাড়ীতে গেল। তাকে পেল না।। তার ছোট বোন আখতার বানু বলল, গতকাল খালা আপাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেছে। জানেন শামী ভাই, আপা ও রাহেলা আপা সেকেণ্ড ডিভিসানে পাস করেছে। আর ফাহমিদা আপা তিনটে লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিসান পেয়েছে।

শামী বলল, আমি ওদের স্কুলে গিয়ে জেনে এসেছি। এখন চলি পরে আর একদিন আসব। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসতে আসতে চিন্তা করতে লাগল, কিভাবে ফাহমিদার সঙ্গে দেখা করবে। জোবেদা বাড়ী ফিরে এলে আর একদিন তার কাছে যাবে ভেবে রাখল।

শামীর দিন যেন কাটতে চায় না। একদিন রায়হানের কাছে গিয়ে বলল, পরীক্ষা সেই কবে হয়ে গেছে। রেজাল্টও বেরিয়ে গেল। এখনো ফাহমিদার কাছ থেকে কোন খবর পাচ্ছি না। কি করা যায় বলতে পারিস?

রায়হান বলল, তুই কারো হাতে চিঠি দিয়ে দেখ, সে কি করে।

ঃ না, তা আমি দেব না। দিলে ওয়াদা ভঙ্গ হবে। আমি ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারবো না।

ঃ ফাহমিদা যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোকে কল করে, তাহলে তো তোর কোন আপত্তি নেই?

ঃ তাতে আপত্তি থাকবে কেন? সে অগ্রভূমিকা নিলে আমার ওয়াদা ভঙ্গ হবে না।

ঃ ঠিক আছে, এখন তুই যা। ভেবে চিন্তে দেখি কি করা যায়।

শামী ভারাক্রান্ত মনে বাড়ী ফিরে এল। মাসখানেকের মধ্যে সে মুন্সীগঞ্জে হরগঙ্গা কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে লাগল। কিন্তু ফাহমিদার জন্য তার মনে একবিন্দু শান্তি নেই। শেষে একদিন জোবেদার কাছে গিয়ে ফাহমিদার কথা জিজ্ঞেস করল।

জোবেদা বলল, ফাহমিদা রামপাল কলেজে ভর্তি হয়েছে।

ঃ তুমি ও রাহেলা ভর্তি হওনি?

ঃ না, আমরা আর পড়ব না।

ঃ কেন?

ঃ রাহেলার তো বিয়ের কথা চলছে।

ঃ তার না হয় বিয়ে চলছে, কিন্তু তুমি ভর্তি হলে না কেন? তোমারও কি সে রকম কিছু হচ্ছে না কি?

জোবেদা এই কথা শুনে লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল।

ঃ কি সত্যি তাই নাকি?

ঃ না তাই নয়। আব্বা আর পড়াতে চান না। ওসব কথা বাদ দিন, কেন এসেছেন বলুন।

ঃ ফাহমিদার সঙ্গে অনেক দিন থেকে যোগাযোগ নেই। তাই তার একটু খোঁজ নিতে এলাম। সে কেমন আছে বলতে পার?

ঃ কেন পারব না? সে তো ভালই আছে। কলেজে যাচ্ছে। মন দিয়ে পড়াশুনা করছে। আপনার সঙ্গে কতদিন যোগাযোগ নেই? আমার সঙ্গে তো কয়েক দিন আগে দেখা হয়েছিল। কই সে রকম কিছু বলল না তো? তাকে কি আপনার কথা বলে ডেকে নিয়ে আসব?

শামী বলল, না না ডাকতে হবে না। সে কেমন আছে, শুধু জানতে এসেছিলাম। আচ্ছা, এবার আসি। তারপর সালাম দিয়ে ত্রস্থপদে চলে গেল।

জোবেদা শামীকে ঔভাবে চলে যেতে দেখে ভাবল, ওদের দু'জনের মধ্যে কি কোন মনোমালিন্য হয়েছে। শামীকে যতদূর দেখা গেল ততদূর তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আড়াল হয়ে যেতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

এদিকে রায়হান চিন্তা করছে কিভাবে শামীকে জানান যায়, ফাহমিদার বিয়ে তার খালাত ভাইয়ের সাথে হবে। আর সেই জন্যে সে এতদিন শামীর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। একদিন রায়হান তার এক সাথীকে নিয়ে শামীদের বাসায় এল। আপ্যায়নের পর তিন জনে গল্প করতে লাগল।

এমন সময় ফাহমিদার ছোট চাচার মেয়ে জমিলা একটা নোট বই হাতে করে নিয়ে এসে শামীকে বলল, ফাহমিদা আপা পাঠিয়েছে। জমিলা ক্লাস ফাইভের ছাত্রী।

জমিলাকে দেখে ও তার কথা শুনে শামীর মুখে আনন্দের ঢেউ ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বইটা নিয়ে ফরফর করে পাতা উল্টে দেখে কিছু না পেয়ে তার মুখটা মলিন হয়ে গেল। বইটা আস্তে করে টেবিলের উপর রেখে বেশ কিছুক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে রইল। তখন তার গ্রীটেষ্টের আগের কথা মনে পড়ল। এই বইটার মধ্যে রফিকের হাতে ফাহমিদাকে শেষ চিঠি পাঠিয়েছিল। এই বইটাই তার আব্বার হাতে চিঠিসহ ধরা পড়েছিল। সেই থেকে বইটা তার কাছে রয়ে গিয়েছিল। তারপর যোগযোগ বন্ধ থাকায় শামীকে আবার একটা নোটবই কিনতে হয়।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জমিলা বলল, আমি তাহলে যাই?

শামী এতক্ষণ বাস্তবে ছিল না। জমিলার কথাশুনে হুশঁ হল। বলল, তুমি যেন কি বললে?

জমিলা বলল, আমি এখন যাই।

শামী বলল, সেকি? একটু চা খেয়ে যাও। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে যাবার সময় রায়হানকে বলল, তোরা একটু বস, আমি আসছি।

জমিলাকে মায়ের কাছে নিয়ে এসে বলল, আম্মা, এ দক্ষিণ পাড়ার আবসার উদ্দিন চাচার ছোট ভাইয়ের মেয়ে জমিলা। একে চা নাস্তা দাও তো।

মাসুমা বিবি বললেন, তুই ওকে তোর ঘরে নিয়ে যা। আমি চা নাস্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শামী তাকে নিজের রুমে এনে চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার ফাহমিদা আপা কেমন আছে?

জমিলা বলল, আপা ভাল আছে।

ঃ তোমার আপা আমাকে বলার জন্য কিছু বলে দেয়নি?

ঃ কই না তো; শুধু বলল, বইটা শামী ভাইকে দিয়ে আয়।

এমন সময় শামীর ছোট বোন চা নাস্তা নিয়ে এলে শামী বলল, নাও নাস্তা খেয়ে নাও।

জমিলা বলল, আপনি খাবেন না?

শামী বলল, তুমি আসার আগে আমি বৈঠকখানায় বন্ধুদের সঙ্গে খেয়েছি।

জমিলার নাস্তা খাওয়া হয়ে যেতে শামী তাকে বিদায় দিয়ে বৈঠকখানায় এসে বসল।

শামী জমিলাকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে চলে যাবার পর রায়হানের সাথী বলল, রায়হান ভাই, তোমার ফিরতে মনে হয় দেরী হবে। আমার একটু কাজ আছে আমি যাই।

রায়হান বলল, ঠিক আছে তাই যাও। আমি শামীর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ গল্প করে ফিরব।

সাথি চলে যাবার পর রায়হান নোট বইটার দিকে চেয়ে চিন্তা করল, শামী মনে করেছিল, বইটার ভিতর ফাহমিদা নিশ্চয় চিঠি পাঠিয়েছে। তাই বইটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টে দেখল। রায়হানের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি খেলে গেল। শামী ফিরে এসে বসার পর বলল, কিরে জমিলার কাছে ফাহমিদার কোন খবর পেলি?

শামী বলল, সে খবর না দিলে পাব কি করে? জমিলাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, আপা ভাল আছে।

রায়হান বলল, ফাহমিদার নিরবতার কারণ কিছু বুঝতে পারলি?

শামী বলল, না। আমার মাথায় তো কিছু আসছে না।

রায়হান বলল, কি আর করার আছে কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাক। জমিলার কাছ থেকে তোর খবর পেয়ে যোগাযোগ করে কিনা দেখ। ফাহমিদাকে বলার জন্য জমিলাকে কিছু বলে দিয়েছিস নাকি?

শামী বলল, না বলিনি।

রায়হান বলল, পরে আবার আসব, এখন চলি। তারপর সালাম বিনিময় করে চলে গেল।

বাড়ীতে এসে রায়হান বুদ্ধিটা কাজে লাগাবার জন্য ফাহমিদার হয়ে শামীকে একটা চিঠি লিখতে বসল। ফাহমিদার দেয়া সব চিঠি শামী রায়হানকে পড়তে দেয়। তার হাতের লেখা সে চিনে। ফাহমিদার হাতের লেখার নকল করে লিখল,

শামী ভাই,

পত্রে আমার সালাম নেবে। পরে জানাই যে, এতদিন তোমার সাথে যোগাযোগ করিনি বলে নিশ্চয় মনে খুব কষ্ট পেয়েছ। কিন্তু কেন যে যোগাযোগ করিনি, তা শুনলে সে কষ্ট আর থাকবে না। আমার প্রতি আব্বা-আম্মার অত্যাচার বেড়েই চলেছে। তারা সব সময় আমার দিকে কড়া নজর রেখেছে। কোথাও যেতে দেয়না। শুধু কলেজ যেতে দেয়। তবে একটা কাজের মেয়ের সঙ্গে যাতায়াত করতে হয়। আমার মনের কথা নিচের কবিতাটি পড়লে বুঝতে পারবে।

হৃদয়ের কান্না শুনবে না কেহ,
শুনবে সেদিন যেদিন থাকব না ভবে।
যদি ভাগ্যের পরিহাসে না হয় মিলন,
তা হলে যতই ঘৃণা কর না আমাকে,
তবু তুমি আমার হৃদয়ের মাঝে
বসরার গোলাপ হয়ে ফুটে থাকবে।

আর বশি কিছু লিখে তোমার কাটা ঘায়ে নুন ছিটাব না। এখানেই রাখছি।

ইতি–ফাহমিদা

দুদিন পর রায়হান চিঠিটা নিয়ে শামীর সঙ্গে দেখা করে বলল, তোর জন্য একটা সুখবর আছে।

রায়হানের কথা শুনে শামীর হার্টবিট বেড়ে গেল। বলল, নিশ্চয় ফাহমিদার খবর? কি খবর তাড়াতাড়ি বল!

রায়হান বলল, ধীরে দোস্ত ধীরে। আগে বল কি খাওয়াবি?

ঃ তুই যা খেতে চাইবি তাই খাওয়াব।

ঃ রাজকন্যার নেক নজর তোর উপর পড়েছে। তোকে তলব করেছে।

ঃ ভূমিকা না করে আসল কথা বল।

রায়হান বুক পকেট থেকে চিঠিটা বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, এটা তোর নোট বইয়ের মধ্যে পেয়েছি। পরশু দিন জমিলা বইটা তোর হাতে দেবার পর তুই যখন পাতা উল্টে দেখছিলি তখন তুই এটা দেখতে না পেলেও আমি পেয়েছিলাম। তারপর জমিলাকে নিয়ে তুই বাড়ীর ভিতর চলে যেতে আমার সাথীও চলে গেল। তখন আমি বই থেকে এটা বের করে পড়তে যাব এমন সময় তোকে আসতে দেখে পকেটে রেখে দিই। ভাবলাম, আমি পড়ার পর তোকে দেব। গতকাল একটু কাজ ছিল, নচেৎ গতকালই তোকে দিতাম।

শামীর তখন রায়হানের কথা শোনার মত অবস্থা নেই। আর চিঠিটাও সত্যি ফাহমিদার লেখা কিনা তা লক্ষ্য করার মত মন মানসিকতা নেই। গোগ্রাসের মত চিঠিটা পড়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করল। তারপর বলল, ফাহমিদা আমাকে কত ভালবাসে এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস?

রায়হান মনে মনে ভাবল, হায়রে অন্ধ প্রেমিক, তবু যদি চিঠিটা ফাহমিদার হত। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলল, তা বুঝেছি। কিন্তু সে যে ভাগ্যের পরিহাসের কথা লিখেছে, সে ব্যাপারে কিছু বুঝতে পেরেছিস?

ঃ ভাগ্যের হাতে সবাই বন্দী। সে কথা ভেবে কি করব? ভাগ্যে যা আছে হবে।

ঃ তোর কথা অবশ্য ঠিক। তবু তুই তাকে একটা চিঠি দিয়ে বল, ভাগ্যের পরিহাসের কথা কেন সে লিখল। সে তোকে সরাসরি বলুক, আমি তোমারই আছি এবং চিরকাল থাকব। না হয় বলে দিক, তোমাকে ভালবাসলেও গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এবার বিদায় দাও।

ঃ সে আমাকে বিদায় দিলেও আমি তাকে কখনো বিদায় দিতে পারব না। সে আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে।

ঃ তবু ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ঃ এ ব্যাপারে আমি তাকে কিছু বলতে পারবো না। সে যদি নিজের থেকে কথা তুলে, তাহলে আলাদা কথা।

ঃ ঠিক আছে, তা না হয় হল। এখন আমার কথা শোন, তুই একটা চিঠি লিখে তাকে তোর মনের কামনা বাসনা–জানা। তারপর সে কি উত্তর দেয় দেখ। আর চিঠিটা লেখার পর আমাকে পড়তে দিস।

ঃ বেশ তাই হবে।

রায়হান আর কিছু না বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রায়হান চলে যাবার পর শামী ফাহমিদাকে চিঠি লিখল—

প্রিয়তমা,

পত্রের প্রারম্ভে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অফুরন্ত পবিত্র ভালবাসা। জানিনা এই হতভাগার সম্বোধন ও ভালবাসা তুমি গ্রহণ করবে কিনা। হয়তো ছোটমুখে বড় কথা বলে অন্যায় করে ফেললাম। যদি তাই হয়, তাহলে নিজগুণে ক্ষমা করে দিও। আশা করি আল্লাহ পাকের রহমতে তুমি ভাল আছ। আর এটাই আমার কামনাও। দোয়া করি, পরম করুণাময় আল্লাহ পাক যেন তোমাকে দীর্ঘায়ু করেন। সুখ শান্তি দিয়ে তোমার জীবন ভরপুর করে দেন। এদিকে আমি এক হতভাগা লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অভিশপ্ত জীবন নিয়ে কোন রকমে দিন যাপন করছি। কি আর করব, সবই আমার কর্মফল। তা না হলে এত অল্প বয়সে মহাঘূর্ণিঝড়ে পড়ে বিধস্থ জীবন নিয়ে চলা ফেরা করছি কেন? আল্লাহ পাককে মালুম, আরো কতদিন এই অভিশপ্ত জীবন আমাকে বহন করতে হবে। যদি বেশি দিন করতে হয়, তাহলে আমার অগ্নিদগ্ধ হৃদয় ভস্মে পরিণত হয়ে যাবে। সেদিন আর তোমার যাত্রা পথে কোন বেরীকেট থাকবে না। ভালবাসার অধিকার নিয়ে তোমার হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারে হাত পাতব না। তখন তুমি হয়তো আনন্দে নাচতে থাকবে। পাবে চিরজীবনের জন্য মুক্তি। যাইহোক, আজকে আমার এই তুচ্ছ লিপির উদ্দেশ্য হল তোমার কাছে দু'টো প্রশ্ন রাখার। তার আগে পূর্বের কিছু ইতিহাস তুলে ধরতে চাই। কারণ আজকের এই পত্র হয়তো তোমার আমার জীবনের শেষ পত্র।

প্রায় চার বছর পূর্বে তুমি আমার হৃদয় আকাশে চোদ্দ দিনের চাঁদের মত উদিত হয়েছিলে। তখন শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা তোমার কাছে প্রকাশ করিনি। একদিন তুমিই প্রথম স্বেচ্ছায় আমার কাছে প্রেম নিবেদন করলে। সেদিন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করে তোমার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিই। এরপর থেকে আমাদের সম্পর্ক গাঢ় থেকে গাঢ় হতে থাকে। কিন্তু তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। হঠাৎ এক তুফান এসে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। যদিও এতদিন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে রয়েছি তবুও তোমার প্রতি মানষিক আকর্ষণ বেড়েছে বই কমেনি। যার ফলে বন্ধু মহলে সবাই আমাকে ঘৃণা করে। নানারকম বিদ্রূপ করে। কিন্তু তারা জানে না, তুমি আমার কাছ কতখানি ভালবাসার পাত্রী। জানেন শুধু তিনিই, যিনি কুলমোখলুকাতের সৃষ্টিকর্তা। ওগো আমার হৃদয়ের রানী, এখন আমার সময় কি

পরিস্থিতির মধ্যে কাটছে, তা যদি তুমি জানতে, তাহলে এতদীর্ঘ সময় যোগাযোগ না করে থাকতে পারতে না। তোমার হৃদয়ে কি এতটুকু দয়ামায়া নেই? শুষ্ক মরুর বুকে মাঝে মধ্যে বৃষ্টিপাত হয়, কঠিন পাথরের বুক ফেটে পানির ধারা নির্গত হয়। কিন্তু তোমার হৃদয় কি কঠিন পাথরের থেকে শক্ত? তা না হলে এতদীর্ঘ বিরহ জ্বালা সহ্য করছ কি করে? দুদুটো বসন্ত পার হতে চলল। বসন্তের সমীরণে তোমার হৃদয় কি দুলে উঠে না? এতে করে কি আমার ভাবা অন্যায় হবে, তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারনি? তাই তুচ্ছ ভেবে ভুলে গেছ? বিশ্বাস কর ফাহমিদা, আজ আমি নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় তোমার প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। চারদিকে শুধু অথৈয় পানি। যার কোন কূল কিনারা নেই। তুমি যদি আমাকে সাহায্যার্থে হাত না বাড়াও, তাহলে সেই সাগরের অথৈ পানিতে আমার সলিল সমাধি হবে। পৃথিবীটাকে আমার বড় নির্মম মনে হচ্ছে।

এবার আসল কথায় ফিরে আসি। প্রেম ভালবাসা কাকে বলে, সেটা অনুভব করার বয়স থেকে তোমাকে ভালবেসে আসছি। যার কারণে তোমাকে একদণ্ডও ভুলে থাকতে পারিনি। তুমি আমাকে কতটা ভালবাস জানি না। চন্দ্র সূর্য যেমন সত্য, আমার ভালবাসাও তেমনি সত্য। চন্দ্র সূর্য না থাকলে পৃথিবী যেমন অচল— তেমনি তোমাকে ছাড়া আমার জীবনও অচল। আমার ভালবাসা পবিত্র। আমি সেই পবিত্র ভালবাসার ও আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলছি, তোমাকে এমনভাবে পেতে চাই, যা সমাজের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য। তোমাদের বংশ মর্যাদা যাতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখব। তোমার কাছে শুধু একটা মিনতি, তুমি আমাকে অবহেলা করে বিরহের আগুনে জ্বালাইও না। দোহাই তোমার, আমাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিও না। জানি ভালবাসলে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়। আর এটাও জানি, ভালবাসার পাত্রীকে একান্ত করে পাবার পর সেই আঘাতগুলো তখন মধুময় হয়ে উঠে। সেই মধু আহরণ করার অধিকার কি আমার নেই? আর কেন বা থাকবে না? তুমিই তো একদিন স্বেচ্ছায় সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পথ দেখিয়েছ। তুমি টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্টের দিন বলেছিলে, আপাততঃ কিছুদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখতে। আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু প্রায় দেড় বছর হতে চলল, সেই কিছুদিন কি এখনো শেষ হয়নি? মনে হয়, আমার কথা ভুলে গেছ। তা না হলে এতদিন দু-একটা চিঠি দিয়ে আমার খোঁজ খবর রাখতে। তুমি হয়তো ভেবেছ, তোমার চিঠির কথা সবাইকে জানিয়ে সমাজে তোমাকে অপমানিত করব, তোমার দুর্নাম রটাব? এরকম ভাবলে তোমার অন্যায় হবে। কারণ আমাদের দু'জনের বাড়ী যখন একই গ্রামে তখন নিশ্চয় আমরা দু'জন দু'জনার বংশ পরিচয় জানি। আমি যে এ রকম করব, তা কি আমার চিঠি পড়ে তোমার মনে হয়েছে? আমার সঙ্গে কথা বলে বা আমার ব্যবহারে আমাকে কি তুমি বাচাল বা পাগল ভাবতে পেরেছ? তা নিশ্চয় ভাবনি। আর যদি সত্যি সত্যি আমাকে ঐ রকম ভেবে থাক, তাহলে জেনে রেখ, যা কিছু হয়েছি, তোমাকে ভালবেসেই হয়েছি। আরো জেনে রেখ, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা, এটা যেমন ধ্রুব সত্য তেমনি তুমি

আমার রক্তকণিকায় মিশে গিয়ে সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হচ্ছ, সেটাও ধ্রুব সত্য। তোমাকে ভুলতে হলে শরীরের সমস্ত রক্ত বর্জন করতে হবে। তুমিই বল রক্ত ছাড়া কি মানুষ বাঁচে?

বিরহজ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেক কিছু লিখে চিঠি লম্বা করে ফেললাম। এবার দুটো পথের কথা বলছি। তার যে কোন একটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে। প্রথমটা হল, তুমি আমাকে ভালবাস না ঘৃণা কর, তা সরাসরি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। আর দ্বিতীয়টা হল, যদি তুমি সত্যি সত্যি আমাকে ভাল না বেসে শুধু অভিনয় করে থাক, তাহলে সে কথা বলার সময় আমাকে এমনভাবে আঘাত দিয়ে অপমান করবে, যার ফলে আমি সেই অপমানের আঘাতে সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ যেন মৃত্যু বরণ করি অথবা তোমার প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায়। বেঁচে থাকলে সেই ঘৃণাকে অবলম্বন করেই বঁচে থাকব, এবং তোমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করব। এ দুটোর যে কোন এটা পথ তোমাকে বেছে নিতেই হবে। চিঠি লিখতে বসে তোমাকে দেখার জন্য আমার মন উন্মাদ হয়ে উঠছে। আর কিছু দেবার জন্য লাগামহীন ঘোড়ার মত ছুটে চলছে। তাই, এখন কিছু দেয়া ঠিক হবে না জেনেও তা বলে ফেলছি; তোমার ফুটন্ত গোলাপী পাপড়ির মত রঙে রাঙ্গান ওষ্ঠদ্বয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে আমার মন চাইছে। জানিনা সেই বাসনা আমার কোনদিন পূরণ হবে কিনা। তবু সেই মূহূর্তের জন্য চিরকাল অপেক্ষায় থাকব। আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার সর্বাঙ্গিন কুশল কামনা করছি। তুমিও আমার জন্য তাই করো। বিদায়ান্তে তোমার প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা। তোমার পত্রের ও সাক্ষাতের আশায় থেকে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি-

তোমার হতভাগ্য প্রেমিক

আঃ শামী

শামী চিঠিটা শেষ করে ভাবল, কাল যেমন করে হোক এটাকে সে নিজে ফাহমিদাকে দিবে। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল তো কলেজ বন্ধ। পরশুদিন কলেজ কামাই করে রাস্তায় ফাহমিদার সঙ্গে দেখা করে দিবার সিদ্ধান্ত নিল।

একদিন পর একটু সকাল সকাল নাস্তা খেয়ে শামী রায়হানের কাছ গেল।

রায়হান তখন পড়ছিল। শামীকে দেখে সালাম বিনিময় করে বলল, আয় বস।

শামী তার পাশে বসে চিঠিটা হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ।

রায়হান পড়ে বলল, খুব ভাল হয়েছে। এটা কিভাবে দিবি ভেবেছিস?

শামী কিভাবে দিবে বলল।

রায়হান বলল, ঠিক আছে, তাই দিস।

শামী তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ করে বুক পকেট রাখল। তারপর বিদায় নিয়ে ফাহমিদার কলেজের পথে রওয়ানা দিল।

চার

ফাহমিদা যখন কিশোর তখন শামীকে তার ভাল লাগত। তারপর তরুণী বয়সে সেই ভাললাগা ভালবাসায় পরিণত হয়। তাদের ফ্যামিলী বেশ মর্ডান। তাই ভাবীদের ইয়ার্কি মশকরায় ও নানারকম গল্প উপন্যাস পড়ে যৌবনে পদার্পণ কারার আগেই বেশ পেকে যায়। শামীর সঙ্গে ফাহমিদার ভালবাসার ব্যাপারটা জেনে ভাবীরা তাদের দু'জনকে নিয়ে প্রায় ঠাট্টা ইয়ার্কি করত। তাতে করে সে যেমন আনন্দ পেত তেমনি তার সাহসও বেড়ে গেছে। তারপর যখন খালা-খালু এসে তাদের ছেলের সঙ্গে ফাহমিদার বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে গেলেন তখন তার ভাবীরা ননদকে শামীকে ভুলে যাবার জন্য বোঝাতে লাগল। তার সাথে যোগাযোগ রাখতেও নিষেধ করল। এরপর যখন শামীর চিঠি ফাহমিদার আব্বার হাতে পড়ল এবং তাকে রাগারাগি করে শাসন করলেন তখন ভাবীরাও তাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে শামীকে মন থেকে একদম মুছে ফেলতে বলল। তার খালাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা এবং শামীদের আর্থিক দুরাবস্থার কথা বলে বোঝাত। ফাহমিদা খালারা যে খুব বড়লোক, পাকা বাড়ী ও গাড়ী আছে এবং খালাত ভাই পাচঁ-ছ বছর আমেরিকায় চাকরি করছে তা জানে। মালেককে সে অনেক আগে দেখেছে। সুন্দর ও গোলগাল চেহারা। তার সাথে বিয়ে হবে শুনে ফাহমিদা প্রথম বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করে। পরক্ষণে শামীর কথা মনে পড়তে মনটা খারাপ হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর তার বড় ভাই ও মেজভাই বিদেশ থেকে এসে যখন তাদের স্ত্রীদের নিয়ে চলে গেল তখন ফাহমিদার এস. এস. সি. পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার পর ফাহমিদা শামী ও মালেককে নিয়ে দোটানার মধ্যে পড়ে গেল।

ছোট শালীর ছেলে মালেকের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাবার পর আবসার উদ্দিন একদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, মালেকের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সে কিছুদিনের মধ্যে দেশে ফিরবে। শামীর সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছ? আর যদি না করে থাক এবং আমি তা জানতে পারি, তাহলে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

বাবার কথায় ভয় পেয়ে ফাহমিদা টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্টের দিন শামীকে তার সাথে কিছুদিন যোগাযোগ করতে নিষেধ করেছিল। তারপর তাকে ভুলে যাবার জন্য এতদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। প্রথম প্রেমের জ্বালা নাকি খুব কঠিন। তাই ফাহমিদা একবার ভাবে যা ভাগ্যে আছে হবে, শামীকে ভুলা সম্ভব নয়। তেমন যদি দেখি, তাহলে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে শামীকে বিয়ে করব। আবার যখন আব্বার হুঁশিয়ারের কথা মনে পড়ে তখন খুব ভয় পেয়ে যায়। ভাবে, শামীর আব্বার অবস্থা তেমন ভাল নয়। আব্বা যদি সত্যি সত্যি শামীর বিরুদ্ধে এ্যাকসান নেয়, তাহলে শামীর আব্বা কি শামীকে রক্ষা করতে পারবে? তারচেয়ে তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল। এইসব ভেবে সে এতদিন শামীর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

আজ কলেজে যাবার পথে দূর থেকে শামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফাহমিদার মনে ভয়মিশ্রিত আনন্দে তোলপাড় শুরু হল। হাঁটার গতি কমে গেল।

শামী দূর থেকেই ফাহমিদার পরিবর্তন লক্ষ্য করল। নিজেই দ্রুত এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে একদৃষ্টে তারদিকে চেয়ে রইল।

প্রায় দেড়বছর পর তাদের দেখা। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। দু'জনে দু'জনের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল, যেন তারা বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কতক্ষণ তারা এভাবে ছিল তা জানতে পারল না। এক সময় দু'জনের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে ফাহমিদা মাথা নিচু করে চোখ মুছতে লাগল।

শামীও চোখ মুছে বলল, সালামের উত্তর দিলে না যে?

ফাহমিদা মাথা নিচু করেই সালামের উত্তর দিয়ে চুপ করে রইল।

শামী বলল, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। লোকজন চেয়ে চেয়ে দেখছে। রাস্তায় পাশে মোড়লদের বাগান বাড়ী। সেদিকে হাত বাড়িয়ে বলল, চল মোড়লদের বাগান বাড়ীতে গিয়ে একটা নিরীবিলি জায়গায় বসি।

ফাহমিদা মাথা তুলে বলল, তাই চল।

মোড়লদের বাগান বাড়ীতে বিরাট একটা পুকুর আছে। পুকুরের একদিকে সান বাঁধান ঘাট। চারপাশের পাড়ে নানারকম ফলের গাছ। সেগুলোর ছায়া ঘাটের উপর পড়েছে। তারা এসে ঘাটের পাকা রকের উপর ছায়াতে বসল। বসার পরও বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

ফাহমিদা মাথা নিচু করে ভাবছে, শামী কিছু জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবে। আর শামী একবার ফাহমিদার মুখের দিকে আর একবার পুকুরের পানির দিকে চেয়ে ভাবছে, ফাহমিদাই আগে কিছু বলুক, তারপর যা বলার আমি বলব।

অনেক সময় অতিবাহিত হবার পরও যখন ফাহমিদা কিছু বলল না তখন শামী ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। বলল, ফাহমিদা তুমি কি বোবা হয়ে গেছ? সালামের উত্তর ছাড়া এতক্ষণ তোমার গলার স্বর শুনতে পেলাম না। প্লীজ কিছু বল।

ঃ কি বলব?

ঃ তোমার কি কিছুই বলার নেই?

ঃ আছে। তবে সে সব বলা সম্ভব নয়।

ঃ তা হলে সত্যি কি তুমি আমাকে ভুলে গেছ?

ঃ ভুলতে পারলে তো বেঁচে যেতাম।

শামী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাই, আমার কথা মনে রেখেছ। এবার বল, এতদিন যোগাযোগ না করে আমাকে কষ্ট দিলে কেন?

ঃ তা বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে জেন রেখ, আমিও কম কষ্ট পাইনি।

ঃ তাই যদি, তাহলে কেন সব কিছু বলতে পারছ না?

ফাহমিদা একটা বইয়ের ভিতর থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে শামীর হাতে দিয়ে বলল, যা কিছু বলার এতে লিখে রেখেছি। কয়েকদিন আগে হঠাৎ আমার মনে হল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাই সেদিন এটা লিখে সঙ্গে করে রেখেছি। আল্লাহ পাকের কি মহিমা, সত্যি সত্যি দেখা হয়ে গেল।

শামীও পকেট থেকে চিঠিটা বের করে ফাহমিদার হাতে দিয়ে বলল, তোমার দীর্ঘদিন নীরবতার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গত পরশু এটা লিখেছি। তুমি আমারটা পড়, আমি তোমারটা পড়ছি।

ফাহমিদা চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল।

তাই দেখে শামী কাগজের টুকরাটা চোখের সামনে মেলে ধরল। দেখল, শুধু কয়েক লাইনের একটা কবিতা। পড়তে শুরু করল।

অনেক না বলা কথার বেদনা
জমা হয়ে আছে এই ভগ্ন হৃদয়ে,
কেমনে শোনাব তাহা আমার প্রিয়জনে?
সেই সব বেদনা, হৃদয়ের মাঝে
ফল্গুধারার মত কান্না হয়ে অবিরত বইছে।
না বলা কথাগুলো, বলার জন্য
পথ কি কোন দনি খুঁজে পাবে?
জানি না ভাগ্য আমাকে কোন পথে নিয়ে যাবে।

ইতি-
ফাহমিদা

শামী কবিতাটা পড়ে চুপ করে ফাহমিদার চিঠি পড়া শেষ না ওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।

ফাহমিদা চিঠি পড়ে তার প্রতি শামীর গভীর ভালবাসার পরিচয় পেল। তখন সে সবকিছু ভুলে গিয়ে শামীর দুটো হাত ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, সত্যি আমি খুব অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

শামী তার ধরা হাত চুমো খেয়ে বলল, তোমার কবিতা পড়ে আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন কথা দাও, এবার থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে?

ফাহমিদা বলল, রাখব। তবে দু'জনকেই খুব সাবধান অবলম্বন করতে হবে। আমাকে বাড়ী থেকে কোথাও যেতে দেয়া হয় না। কলেজে আসি তাও একজন কাজের মেয়ে থাকে। তার অসুখ হয়েছে। তাই আজ একা এসেছি। আব্বা বাড়ীতে নেই। থাকলে একা আসতে দিত না। তারপর আব্বা কিভাবে শামীর চিঠি রফিকের কাছে পেল এবং তার ফলাফল কি হয়েছিল, সব বলে বলল, এখন তুমিই বল, কি করে আমাদের যোগাযোগ হবে?

শামী একটু চিন্তা করে বলল, আমি প্রতি বৃহস্পতিবার তোমার সঙ্গে কলেজে দেখা করব।

ফাহমিদা বলল, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ক্লাস কামাই করবে?

শামী বলল, ঐদিন মাত্র দু'টো ক্লাস। বাড়ীতে পড়ে মেকাপ দিয়ে নেব। ও নিয়ে তুমি কিছু ভেব না।

ফাহমিদা বলল, বেশ তাই হবে। এখন চল ওঠা যাক।

শামী বলল, হ্যাঁ তাই চল। নচেৎ তোমার আরো একটা ক্লাস নষ্ট হবে। এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে।

সেদিন শামী ফাহমিদাকে কলেজে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরল।

শামী যেন আজ নবজন্ম লাভ করল। ফেরার পথে রায়হানের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলল। তারপর কবিতাটা পড়তে দিল।

কবিতাটা পড়ার পর রায়হানের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। বুঝতে পারল, ফাহমিদাও শামীকে ভালবাসে। কিন্তু তার মা-বাবা তো কিছুতেই শামীকে জামাই করবে না। সে জন্যে তারা মালেকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে রেখেছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে শামী বলল, মনে হচ্ছে কিছু যেন ভাবছিস?

রায়হান বলল, না, মানে ভাবছি, ফাহমিদা তোকে ভালবাসে ঠিক; কিন্তু তার মা-বাবা তোর সঙ্গে কি বিয়ে দেবে? তোদের কি আছে? কি দেখে দেবে? ওরা বড়লোক। এক মেয়েকে কি তারা তোর মত ছেলের হাতে তুলে দিতে রাজি হবে? আমার মনে হয় তুই ভুল পথে চলেছিস। এখনো ফিরে আসার সময় আছে। তুই আমার বাল্যবন্ধু। তোর ভালমন্দ কিছু হলে, আমিও কম দুঃখ পাব না। আমার কথাগুলো ভেবে দেখিস।

শামী বলল, তুই অবশ্য প্রকৃত বন্ধুর মত কথা বলেছিস। তোর কথাগুলো আমারও যে মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু দোস্ত, মৃত্যু ছাড়া আমার যে ফেরার আর কোন পথ নেই। ফাহমিদাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, ফাহমিদাকে পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। তবু মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না। তবে একথা ঠিক, তার উপযুক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করব।

রায়হান বুঝতে পারলে, ওকে বুঝিয়ে কোন কাজ হবে না। বলল, তোর জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। দোয়া করি আল্লাহ তোর মনস্কামনা পূরণ করুক।

সেদিন শামী বাড়ী ফিরে এসে পূর্ণ উদ্দমে পড়াশুনা শুরু করল।

এতদিন ধরে ফাহমিদা মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে যতটা না শামীকে মন থেকে সরাতে পেরেছিল, আজ তার সাথে দেখা হয়ে এবং তার চিঠি পড়ে তারচেয়ে বেশি করে মনে পড়তে লাগল। চিন্তা করল, ভাগ্যে যা আছে, তাকে যখন প্রতিরোধ করতে পারব না তখন আর শামীর সাথে যোগাযোগ রাখব না কেন?

এরপর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার তাদের অভিসার চলতে লাগল। এভাবে এইচ. এস. সি. ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত তাদের কোন বাধা এল না। কিন্তু পরীক্ষার পর আবার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় আড়াই মাস পর রেজাল্ট বেরোতে শামী ডিগ্রীতে এ্যাডমিশন নিল। ফাহমিদার খোঁজে একদিন জোবেদার কাছ এসে জানতে পারল, সে আর পড়বে না। কথাটা জেনে তার মন খারাপ হয়ে গেল। ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগল, কি করে তার সঙ্গে দেখা করা যায়? এভাবে কিছু দিন কেটে যাবার পর একদিন রাহেলাকে তাদের বাড়িতে আসতে দেখে শামী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার হঠাৎ কি মনে করে?

রাহেলা হাসিমুখে বলল, কেন আসতে মানা আছে নাকি?

ঃ মানা থাকবে কেন? তুমি কোন দিন আসনি তো, তাই আর কি। তাছাড়া তোমার বিয়ে হল, একটা খবরও পেলাম না।

ঃ বিয়েটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে। আমার তো কোন ভাই নেই যে, তাকে দিয়ে খবর দেব। আমি তো আর নিজে আসতে পারি না? তা আপনাদের কি খবর বলুন।

ঃ আল্লাহ পাকের রহমতে আমরা সবাই ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বল। স্বামীর বাড়ীতে ভাল আছ আশা করি?

ঃ তা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে এক রকম আছি। আমি কিন্তু আপনাদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করিনি; আপনার ও ফাহমিদার কথা করেছি।

ঃ এইচ. এস. সি, পরীক্ষার পর থেকে তার সাথে যোগাযোগ নেই। কি করে তার খবর বলব বল?

ঃ আমি যোগাযোগ করে দিতে এসেছি।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ তাই। আমার চাচার ওলিমা আগামী শুক্রবার। আপনাকে দাওয়াত দিতে এসেছি। ফাহমিদাকেও দিয়েছি। সেদিন আমাদের বাড়ীতে যোগাযোগ হবে।

শামী মনে আনন্দিত হয়ে বলল, আচ্ছা? তাহলে তো তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

ঃ শুধু ধন্যবাদ দেবেন? আর কিছু দেবেন না? এতবড় একটা সুযোগ করে দিলাম।

ঃ আর কি চাও বল, দিতে কার্পণ্য করব না।

রাহেলা হেসে উঠে বলল, না শামী ভাই, আর কিছু দিতে হবে না। আল্লাহ পাক আমাকে যা দিয়েছেন, তাতেই আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারিনি।

শামী হাসিমুখে বলল, শুনে খুশী হলাম। শামী বোনকে চা নিয়ে আসতে দেখে বলল, চা খাও।

রাহেলা চা খেয়ে বিদায় নিয়ে যাবার সময় বলল, আপনি সকাল সকাল আসবেন।

শামী বলল, সে কথা তোমাকে আর বলে দিতে হবে না।

রাহেলার চাচার ওলিমা এখনো তিনদিন বাকি। শামী সেই দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। দিন যেন কাটতে চায় না। এক একটা দিন যেন এক একটা বছর বলে মনে হতে লাগল। অবশেষে সেই প্রতিক্ষিত দিনটা এল। শামী সকালে নাস্তা খেয়ে রাহেলাদের বাড়ীতে গেল।

কিছুক্ষণ পর রাহেলা একটা লুংগী পাঞ্জাবী পরা হ্যাণ্ডসাম যুবককে সঙ্গে করে শামীর কাছে এসে সালাম দিল। সেই সাথে যুবকটাও সালাম দিল।

শামী সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ইনাকে তো চিনতে পারছি না।

রাহেলা হাসিমুখে বলল, পরিচয় করিয়ে দিতে তো নিয়ে এলাম। ইনিই আমার উনি। তারপর যুবকটাকে উদ্দেশ্য করে শামীকে দেখিয়ে বলল, ইনি শামী ভাই। উত্তর পাড়ায় বাড়ী। ইনারই কথাই তোমাকে একদিন বলেছিলাম।

যুবকটা এগিয়ে এসে শামীর সঙ্গে হাত মোসাফা করে বলল, আমি রহিম।

শামী হেসে উঠে বলল, আপনাদের দু'জনের নামের কিন্তু দারুণ মিল। আল্লাহ পাক আপনাদের সুখী করুন। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম। তারপর রাহেলাকে জিজ্ঞেস করল, জোবেদাকে দাওয়াত দাওনি?

রাহেলা বলল, তাকে আবার দিইনি। তিন চার দিন আগে তার ডায়রিয়া হয়েছিল। তাই হয়তো আসেনি।

শামী আবার জিজ্ঞেস করল, ফাহমিদা আসেনি?

রাহেলা মৃদু হেসে বলল, না আসেনি। এলে আমি তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব। এখন যাই কাজ আছে। তারপর যুবকটাকে বলল, তুমিও চল, আব্বা তোমাকে বাজারে পাঠাবে বলছিল। পরে এক সময় শামী ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করো। কথা শেষ করে তাকে সাথে করে চলে গেল। ফাহমিদা যখন বেলা একটার সময় এল তখন শামী নামায পড়তে মসজিদে গেছে।

নামায পড়ে এসে খাওয়া দাওয়ার পর শামী বৈঠকখানায় বসে ফাহমিদার কথা চিন্তা করছিল। একটু পরে রাহেলা তাকে ডেকে নিয়ে একটা রুমের দরজার কাছে এসে বলল, ভিতরে যান, ফাহমিদা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। মনের সুখে দু'জনে গল্প করুন। এখানে কেউ আসবে না। কথা শেষ করে সে চলে গেল।

শামী রুমে ঢুকে দেখল, ফাহমিদা তক্তপোষের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। দরজা ভিড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছ?

ফাহমিদা সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ভাল আছি। তুমি?

শামী বলল, শারীরিক ভাল থাকলেও মানষিক যন্ত্রণায় ভুগছি। এতদিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় বিরহ জ্বালায় জ্বলছি। তুমি পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কেন?

আমি তো পড়তে চাই। কিন্তু আব্বা পড়াতে রাজি নয়। আমরা যে আবার মেলামেশা করেছি, সে কথা আব্বা বোধ হয় সন্দেহ করেছে। তাই পড়াতে রাজি হয়নি।

ঃ আচ্ছা সপ্তাহে না হলেও মাসে অন্ততঃ একদিন এখানে অথবা জোবেদাদের বাড়ীতে বেড়াবার নাম করে আসতে পার না? ঐদিন আমিও আসব।

ঃ তা হয়তো দু'একবার পারব। কিন্তু প্রতি মাসে এলে ধরা পড়ে যাব।

ঃ তা অবশ্য ঠিক কথা বলেছ। আমার কি মনে হচ্ছে জান?

ঃ কি?

আজকেই তোমাকে বিয়ে করে ফেলি।

ঃ করছ না কেন?

ঃ উপযুক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে তোমাকে ঘরে তুলতে চাই। তাছাড়া তোমাদের বংশের সম্মানের দিকে চেয়ে তা পারছি না। তোমার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তুমি কি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে না?

ঃ আমিও তাই চাই। কিন্তু একটা গ্রাম্য বালিকার কতটুকু ক্ষমতা তা তো তুমি জান। অন্ততঃ বি. এ. পর্যন্ত পড়তে চাইলাম। তাও যখন পড়তে দিল না তখন তোমার জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে পারব তা এখন বলব কি করে?

ঃ আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

ঃ বল, পারলে নিশ্চয় রাখব।

ঃ তোমার যখন অন্য কোথাও বিয়ের কথা হবে তখন আমাকে জানাবে।

ঃ জানালে কি করবে?

ঃ আব্বাকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাব।

ঃ আমার আব্বা রাজি হবে না।

ঃ তখন তুমি তোমার আব্বাকে নিজে না পারলে ও অন্য কাউকে দিয়ে নিজের মতামত জানাবে।

ফাহমিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তার ফলাফল আরো ভয়াবহ হবে। সবাই মনে করবে, তোমার সাথে বরাবর যোগাযোগ রেখেছি। তবু আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করব।

শামী বলল, আমিও আব্বাকে দিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করাব। বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। এখন যা বলছি শোন, জোবেদাদের বাড়ী থেকে তোমাদের বাড়ী এখনকার চেয়ে কাছে। পারলে দু-এক মাস অন্তর সেখানে এসে জোবেদাকে বলো, সে যেন আমাকে খবর পাঠায়। আর আমিও মাঝে মাঝে জোবেদার হাতে চিঠি দিয়ে বলব, সে যেন তোমাকে দেয়। সেই সময় তুমিও তার হাতে উত্তর দিও।

ফাহমিদা বলল, বেশ তাই হবে।

এমন সময় রাহেলা দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে এস বলল, শামী ভাই, আপনারা তো অনেকক্ষণ গল্প করলেন, নিশ্চয় গলা শুকিয়ে গেছে। চা পান করে গলা ভিজিয়ে নেন।

চা খেয়ে শামী তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

উক্ত ঘটনার দিন পনের পর জোবেদা তার চাচাতো বোনের বিয়ের উৎসবে শামী ও ফাহমিদাকে দাওয়াত দিল। রাতে উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শামী সন্ধ্যের আগে এসেছে। ফাহমিদা আসছে না দেখে জোবেদা তাদের বাড়ীতে গেল।

ফাহমিদার মা শাকেরা খানম জোবেদাকে বললেন, তোমার চাচা বাড়ীতে নেই। তার অনুমতি ছাড়া আমি পাঠাতে পারব না।

জোবেদা অনেক করে বলে উনাকে রাজি করালেন। তবু আসবার সময় শাকেরা খানম বললেন, খাওয়া দাওয়ার পর ওকে তুমি দিয়ে যেও।

জোবেদা বলল, চাচী আম্মা কি যে বলেন, ফাহমিদা আজ আমার কাছে থাকবে। কাল সকালে আসবে। বিয়ের রাতে আসা যায় নাকি?

শাকেরা খানম আর কিছু বললেন না।

বিয়ের কাজ মিটে যাবার পর এক সময় খাওয়া-দাওয়ার কাজও শেষ হল।

এখানে আসার পর থেকে শামীর মন ফাহমিদার সঙ্গে দেখা করার জন্য অস্থির রয়েছে। একসময় জোবেদা তাকে বলে গেছে, আজ আপনি বাড়ী যাবেন না। এখন কাজের খুব চাপ। রাতে ফাহমিদার সাথে আলাপ করবেন। এখন রাত একটা। শামী একটা চেয়ারে বসে বসে ভাবছে, জোবেদা না হয় কাজে ব্যস্ত, ফাহমিদা তো তার

সাথে দেখা করতে পারত। শেষে শামী আর ধৈর্য ধরতে না পেরে জোবেদাদের বাড়ীর ভিতরে গিয়ে সব ঘরে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কাউকেই পেল না। ভাবল, কোথাও একটু জায়গা পেলে ঘুমানো যেত। কোন ঘরেই একটুও ফাঁকা নেই। সব ঘরেই মেহমান ঠাশা। শুধু একটা রুমে তালা দেয়া দেখল। কোন আশায় যখন পূরণ হল না তখন আগের জায়গায় এসে ঝিমোতে লাগল।

শামী যখন জোবেদা ও ফাহমিদাকে খুঁজছিল তখন তারা-প্রকৃতির ডাকে খিড়কী পুকুরের দিকে গিয়েছিল। ফিরে এসে জোবেদা তালা দেয়া ঘর খুলে ফাহমিদাকে বসতে বলে বলল, একটু অপেক্ষা কর, আমি শামী ভাইকে ডেকে নিয়ে আসি। বেচারা হয়তো বাইরে চেয়ারে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। তারপর বাইরে এসে সত্যিই তাই দেখল। জোবেদা তার একটা হাত ধরে বলল, শামী ভাই, আসুন আমার সঙ্গে।

শামী বিরক্তিপূর্ণ চোখে জোবেদার দিকে তাকিয়ে বলল, মেহমানদের পিছনে অনেক খেটেছি। এখন আর কোন ফরমাইশ শুনতে পারব না।

জোবেদা বুঝতে পারল, বেচারা ঘুমে কাতর হয়ে পড়েছে। তার উপর ফাহমিদার সঙ্গেও দেখা হয়নি। মুচকি হেসে বলল, আর ফরমাইশ করব না, আসুন তো আমার সঙ্গে।

অগত্যা শামী একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে বলল, চল তাহলে।

জোবেদা তাকে ফাহমিদার কাছে নিয়ে এল। তারপর বেরিয়ে এসে দরজা লক করার সময় বলল, আমি কিছুক্ষণ পরে আসব। আপনারা ততক্ষণ কথা বলুন।

শামী ফাহমিদাকে খাটে বসে থাকতে দেখে আনন্দে কোন কথা বলতে পারল না। একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ফাহমিদারও একই অবস্থা। এদিকে সময় যে চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাদের খেয়াল নেই।

প্রায় দশ পনের মিনিট পর জোবেদা চা নাস্তা নিয়ে এসে তাদের দু'জনকে একে অপরের দিকে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে শামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, শামী ভাই, আপনি এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন? তারপর ফাহমিদার দিকে চেয়ে বলল, কিরে তুই শামী ভাইকে বসতে বলিসনি?

শামী যেন এতক্ষণ বাস্তবে ছিল না। জোবেদার কথা শুনে খাটের একপাশে বসে বলল, এসব আবার আনতে গেলে কেন? আমাকে শুধু চা দাও।

চা নাস্তা খেয়ে তিন জনে গল্প করতে লাগল। এক সময় জোবেদা বলল, আপনারা গল্প করুন, আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমোলাম বলে খাটের একপাশে শুয়ে পড়ল।

শামী যখন বুঝতে পারল, জোবেদা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে ফাহমিদার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলল, কিছু মনে করছ না তো?

ফাহমিদা বলল, এতে মনে করার কি আছে?

শামী বলল, বিয়ের আগে এটা অন্যায় জেনেও করে ফেললাম। আমার অনেক

দিনের আশা, তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাব। তা সুযোগ পেয়ে সেই আশা পূরণ করলাম। স্মৃতির পাতায় আজকের এই রাতের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ফাহমিদা বলল, আমার জীবনে তুমি একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার আলোতে আমার হৃদয় দিবালোকের মত আলোকিত। তোমাকে যদি না পাই, তাহলে আমার জীবনে নেমে আসবে গভীর অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকারের অতল সাগরে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাব।

ফাহমিদার কথা শুনে শামী আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিবেক হারিয়ে ফেলল। ধড়মড় করে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে তার দুগাল চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে বলল, সত্যি বলছ ফাহমিদা? তোমার কথা শুনে আমি যে আনন্দ ধরে রাখতে পারছি না। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

শামীর আলিঙ্গনে ও আদরে ফাহমিদা ভীত কপোতির ন্যায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, হ্যাঁ শামী সত্যি বলছি। তোমাকে না পেলে আমি মরেই যাব।

আনন্দে শামীর চোখে পানি এসে গেল। বলল, তোমাকে না পেলে আমিও বাঁচব না। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, ছিছি, কতবড় গোনাহ'র কাজ করে ফেলাম। এইজন্যে আল্লাহ পাক বেগানা নারী-পুরুষকে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আমরা ওয়াদা করছি, বিয়ের আগে এইরূপ কাজ আর করব না। তুমি না মাফ করলে আমাদের নাজাতের উপায় থাকবে না।

এদিকে কখন যে রজনী শেষ হয়ে সুবেহ সাদেক হয়ে গেছে তারা টের পেল না। মোয়াজ্জেনের আযানের সুমধুর সুর শুনে তাদের খেয়াল হল, ভোর হয়ে গেছে।

আযানের শব্দে জোবেদারও ঘুম ছুটে গেল। উঠে বসে তাদের দুজনকে বসে থাকতে দেখে ফাহমিদাকে উদ্দেশ্যে করে বলল, কিরে তুই আর শামী ভাই বুঝি গল্প করে রাত কাটিয়ে দিলি?

ফাহমিদা বলল, তা বুঝতেই যখন পেরেছিস তখন আর জিজ্ঞেস করছিস কেন?

শামী জোবেদার অলক্ষ্যে চোখ মুছে বলল, আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাচ্ছি। নামায পড়ে বাড়ী চলে যাব।

জোবেদা বলল, সে কি? নাস্তা খেয়ে যাবেন না?

শামী বলল, আজ আর নয়। আর একদিন খাব। তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

শামী চলে যাবার পর ফাহমিদাকে লম্বা হয়ে শুতে দেখে জোবেদার ক্লাস টেনে পড়ার সময় তারা নামায পড়েনি জেনে শামী ভাই সেদিন নামায না পড়ার কুফল ও পড়ার সুফল সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছিল সেসব মনে পড়ল। বলল, কিরে শুলি যে, নামায পড়বি না? সেদিন শামী ভাই অত করে বলার পরও নামায ধরিসনি? আমি কিন্তু সেই দিন থেকে নামায ধরেছি। একদিন শামী ভাই আমাদের বাড়ীতে

এসে আমি নামায ধরেছি শুনে অনেক হাদিসের কথা বলেছিলেন। তারপর পুকুর ঘাটে অজু করতে যাবার সময় জোবেদা ফাহমিদাকে বলল, তুই নামায ধর। জানিস না বুঝি, হাদিসে আছে, আমাদের রসুল (সঃ) বলছেন, "তাহাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে নামাযই পার্থক্যের বিষয়। যে ইহা ত্যাগ করে, সে কাফির।"[১]

জোবেদা আবার বলল, শামী ভাই কত পরহেজগার ছেলে। তাকে তুই ভালবাসিস অথচ নামায পড়িস না, এ কেমন কথা? তাছাড়া এই হাদিস জানার পর শুধু তুই কেন, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর নামায পড়া উচিত। চল আমার সঙ্গে অজু করে আসবি। আজ ফযর থেকে শুরু করবি।

ফাহমিদা বলল, আমার এখন . . . চলছে, পাক হবার পর পড়ব।

জোবেদা আর কিছু না বলে অজু করার জন্য বেরিয়ে গেল।

একটু বেলা হতে ফাহমিদা নাস্তা খেয়ে বাড়ী চলে গেল।

এরপর থেকে শামী মন দিয়ে পড়াশুনা করে খুব ভালভাবে বি. এ. পরীক্ষা দিল। এই এক বছরের মধ্যে ফাহমিদার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ হয়নি। মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়লে সেই রাতের ফাহমিদার কথা স্মরণ করে মনকে প্রবোধ দিয়ে ভাল রেজাল্ট করার জন্য চেষ্টা করেছে। পরীক্ষার পর তার মন আর বাধ মানল না। তাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কি করে দেখা করবে যুক্তি করার জন্য রায়হানের কাছে গেল।

রায়হান এখন কামেলে পড়ছে। শামীকে দেখে সালাম বিনিময় করে বলল, কিরে দোস্ত, কেমন আছিস? পরীক্ষা কেমন দিলি? অনেক দিন তো এদিকে পা মাড়াসনি।

শামী বলল, আল্লাহ পাকের রহমতে পরীক্ষা খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু ফাহমিদার সঙ্গে প্রায় একবছর যোগাযোগ নেই। এতদিন তবু পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এবার তার সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারছি না। কি করা যায় বলতে পারিস?

রায়হান এই এক বছরের মধ্যে ফাহমিদার অনেক কিছু জেনেছে। সেসব বললে শামী মনে ভীষণ কষ্ট পাবে ভেবে চেপে গেল। বলল, তুই যে কোন উপায়ে তার সঙ্গে দেখা কর। এছাড়া আমি তো অন্য কোন পথ দেখছিনা।

শামী তাই করতে হবে বলে সালাম বিনিময় করে ফিরে এসে চিন্তা করতে লাগল, কিভাবে ফাহমিদার সঙ্গে দেখা করা যায়।

পাঁচ

এরমধ্যে ফাহমিদার খালাত ভাই মালেক প্রায় সাত বছর পর আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এল। তাদের বাড়ী টঙ্গিবাড়ীতে। টঙ্গিবাড়ী বি. টি. কলেজ থেকে মালেক আই. এ. পাস করে আমেরিকা চলে গিয়েছিল। সেখানে আরো পড়াশুনা করে চার বছর হল চাকরি করছে। ছ-মাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে। তার মা-বাবার ইচ্ছা ছেলের বিয়ে দেবে। তাই কয়েক দিন পর তার মা জহুরা খানম ছেলেকে বললেন, আমরা তোর বিয়ে দিতে চাই।

টীকা ঃ ১-বর্ননায়ঃ হজরত বোরায়দা (রাঃ) তিরমিজী নেসায়ী।

মালেক বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে এসেছে। সে কথা কাউকে দিয়ে মা বাবাকে জানাবে ভেবেছিল। তার আগেই মাকে বলতে শুনে মনে মনে খুব খুশী হল। তবু ডাইরেক্ট মত প্রকাশ না করে বলল, আমার ইচ্ছা ছিল, পরের বারে এসে বিয়ে করার।

জহুরা খানম বললেন, আবার কতদিন পরে আসবি তার ঠিক আছে। এবারে বিয়ে করবি না কেন শুনি? আমরা তোর কথা শুনব না। তোর বাবা বলছিল, কোথায় যেন একটা ভাল মেয়ে দেখে রেখেছে।

মালেক বলল, তোমরা যখন চাচ্ছ তখন আর না করব না। তবে যেখানেই মেয়ে দেখে রাখ না কেন, মেয়েকে ও তার মা-বাবাকে জানিয়ে দিও, বৌ নিয়ে আমি আমেরিকা চলে যাব।

জহুরা খানম বললেন, তাতো বটেই তুই আমেরিকায় থাকবি, আর তোর বৌ এখানে থাকবে, তা কি করে হয়? তোর বৌকে তুই নিয়ে যাবি, তাতে কারো অমত থাকবে কেন?

মালেক বলল, তোমাদের মত থাকলে তো চলবে না। মেয়ের মা-বাবা যদি তাদের মেয়েকে অতদূর পাঠাতে না চায়? সে মেয়েও যদি যেতে রাজি না হয়, তখন কি হবে? তার চেয়ে আগে ভাগে জানিয়ে দেয়া ভাল।

জহুরা খানম বললেন, সে ব্যাপারে তোকে ভাবতে হবে না। আমরা মেয়ের মা-বাবাকে আগেই সে কথা বলে রেখেছি।

মালেক বলল, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

জহুরা খানম একটু চিন্তা করে তার বড় বোনের মেয়ে ফাহমিদাকে বৌ করবে বলে যে ঠিক করে রেখেছেন, তা ছেলেকে জানালেন না। কারণ সে যদি অমত করে বসে। তারচেয়ে নিজে আগে দেখে আসুক। ফাহমিদাকে দেখলে মালেক নিশ্চয় পছন্দ করবে। তারপর যা বলার বলা যাবে। বললেন, হ্যাঁরে, কয়েকদিন আলদি বাজারে তোর বড় খালার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আয় না। কিছু দিন আগে আমি ও তোর বাবা গিয়েছিলাম। আমাদের মুখে তুই দেশে আসবি শুনে তোর খালা-খালু বলল, মালেক এলে তাকে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতে বলো। কতদিন ছেলেটাকে দেখিনি।

মালেক বলল, যাব না মানে, নিশ্চয় যাব। তুমি না বললেও যেতাম। কতদিন পর দেশে এলাম। সব আত্মীয়দের বাড়ীতে গিয়ে সবাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব।

জহুরা খানম বললেন, বেশ তো যাবি।

পরের দিন মালেক গাড়ী নিয়ে আলদি বাজারে ফাহমিদাদের বাড়ীতে এল। খালা-খালুকে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, আপনারা ভাল আছেন?

উনারা দোয়া করার পর শাকেরা খানম বললেন, আমরা ভাল আছি বাবা। এতদিন পর দেশের কথা মনে পড়ল বুঝি?

সেখানে ফাহমিদা ছিল। সেও কয়েকদিন আগে মায়ের মুখে শুনেছে; মালেক সাত বছর পর দেশে ফিরবে। যখন খালা-খালুর মুখে তাকে বৌ করার কথা বলতে শুনেছিল তখন শামীর কথা ভেবে মালেকের উপর বেশ রাগ হয়েছিল। ভেবেছিল, যে ছেলে এত বছর মা বাবাকে ছেড়ে বিদেশে থাকে, সে ভাল হতে পারে না। এখন মালেকের সুন্দর ও সুঠাম চেহারা দেখে রাগের পরিবর্তে মনে মনে বেশ পুলকিত

হল। ভাবল, যে মেয়ে একে স্বামী হিসেবে পাবে, সে ধন্য হয়ে যাবে। ফাহমিদা এতক্ষণ মালেকের দিকে চেয়ে এইসব ভাবছিল।

মালেক তার দিকে চাইতে চোখে চোখ পড়ে গেল। মালেক তাকে দেখে মনে মনে চমক খেল। ভাবল এত সুন্দরী মেয়ে তা হলে বাংলাদেশে আছে? সাত বছর আগের কিশোরী ফাহমিদা এখন পূর্ণ যুবতী। তার দিক থেকে মালেক চোখ ফেরাতে পারল না।

ফাহমিদা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল।

শাকেরা খানম ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মালেককে বললেন, তুমি ওকে চিনতে পারছ না? ওতো ফাহমিদা। তারপর ফাহমিদা বললেন, কিঁরে তুই চুপ করে দাঁড়িযে রয়েছিস কেন? তুইও চিনতে পারিসনি বুঝি? মালেক তোর ছোট খালার ছেলে। কদমবুসি কর।

ফাহমিদা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে কদমবুসি করল।

মালেক থাক থাক বলে বলল, তোমাকে অনেক ছোট দেখেছিলাম। তাই প্রথমে চিনতে পারিনি, এখন পারছি। তা পড়াশুনা করছ তো?

ফাহমিদা কিছু বলার আগে শাকেরা খানম বললেন, দু'বছর আগে আই. এ. পাস করার পর আমরা আর পড়াইনি। আজকাল সমাজের আজে বাজে ছেলেদের কথা চিন্তা করে পড়া বন্ধ করে দিয়েছি। তারপর মেয়েকে বললেন, যা তোর মালেক ভাইকে চা নাস্তা এনে খাওয়া।

ফাহমিদা চলে যাবার পর শাকেরা খানম স্বামীকে বললেন, তুমি না কোথায় যাবে বলছিলে? ফেরার সময় কিছু মাংস নিয়ে এস। মাছ আছে। মালেক কি শুধু মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারবে?

আবসার উদ্দিন স্ত্রীর ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন। বললেন, হ্যাঁ তাই তো। আমি সে কথা ভুলেই গেছি। কথা শেষ করে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

শাকেরা বেগম মালেককে বললেন, তুমি বস, ফাহমিদা নাস্তা নিয়ে আসছে। আমি যাই, তোমার খালুকে আরো কয়েকটা জিনিস আনার কথা বলে পরে আসব।

খালা-খালু চলে যাবার পর মালেক ফাহমিদার কথা ভেবে চিন্তা করতে লাগল, বাবা কেমন মেয়ে পছন্দ করেছে কি জানি। আমার তো মনে হয় ফাহমিদার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে এদেশে নেই। ফাহমিদার কথা মাকে বলতে হবে।

একটু পরে ফাহমিদা চা নাস্তা নিয়ে এসে পরিবেশন করে বলল, নিন শুরু করুন।

মালেক ফাহমিদার রূপ দেখে আগেই মুগ্ধ হয়েছে। এখন তার গলার সুমিষ্ট স্বর শুনে আরো বেশি মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ফাহমিদা লজ্জা পেয়ে বলল, এভাবে কি দেখছেন? নাস্তা খেয়ে নিন।

মালেক বলল, সত্যি বলতে কি, আমেরিকায় অনেক সুন্দরী মেম দেখেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তাদের থেকে তুমি অনেক বেশি সুন্দরী।

ফাহমিদা ছোটবেলা থেকে সবাইয়ের কাছে রূপের প্রশংসা শুনে এসেছে। কিন্তু এভাবে কেউ বলেনি। আরো বেশি লজ্জা পেয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, তাই নাকি? আপনিও কিন্তু খুব সুন্দর।

মালেক হো হো করে হেসে উঠে বলল, এর আগে কোন মেয়ের মুখ থেকে এ কথা শুনিনি। যাকগে, আমি একা খাব নাকি? তোমারটা কই?

ফাহমিদা বলল,আমি একটু আগে খেয়েছি, এখন আর খেতে পারব না।

মালেক বলল, ওসব শুনব না একটু হলেও খেতে হবে। তারপর তার একটা হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে বলল, এখান থেকেই খাও।

ফাহমিদা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অল্প একটু মুখে দিয়ে বলল, এবার আপনি খেয়ে নিন। তারপর হাত ধুয়ে সরে বসল।

মালেক আর কিছু না বলে খেতে লাগল। চা খাবার সময় বলল, তুমি পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কেন? ডিগ্রী পর্যন্ত পড়া উচিত ছিল।

ঃ আমি তো পড়ার জন্য খুব জিদাজিদী করেছিলাম। মা বাবা কিছুতেই রাজি হল না।

ঃ খালা বলল, গ্রামের আজে বাজে ছেলেদের ভয়ে তোমার পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। তুমি আমাদের বাড়ীতে থেকে বি. টি. কলেজে পড়তে পারতে?

ঃ সে কথাও আমি বলেছিলাম; কিন্তু রাজি হয়নি।

ততক্ষণে মালেকের চা খাওয়া হয়ে গেছে। ফাহমিদা নাস্তার প্লেট ও চায়ের কাপ নিয়ে যাবার সময় বলল, এগুলো রেখে আসছি।

দুপুরে খাওয়ার পর মালেক বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ফাহমিদার কথা চিন্তা করছিল।

এমন সময় ফাহমিদা রুমে ঢুকে বলল, আম্মা জিজ্ঞেস করতে পাঠাল, এখন আপনার আর কিছু দরকার আছে কিনা।

মালেক উঠে বসে বলল, না আর কোন কিছু দরকার নেই। তুমি বস তোমার সঙ্গে গল্প করি। দিনে ঘুমান আমার অভ্যাস নেই।

ফাহমিদা বলল, বসলেন কেন? শুয়ে শুয়ে গল্প করুন। আমি এখানে বসছি বলে একটা চেয়ারে বসল।

মালেক শুয়ে পড়ে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। খালা একটু বেশি খাইয়ে দিয়েছে। চল আজ বিকেলে মুন্সীগঞ্জে গিয়ে সিনেমা দেখে আসি।

কবে সিনেমা দেখেছে ফাহমিদার মনে নেই। মালেকের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে বলল, আব্বা-আম্মা কি যেতে দেবে?

ঃ তুমি রাজি আছ কি না বল। আমি খালা-খালুকে ম্যানেজ করব।

ঃ তাহলে আমি রাজি।

ঃ তুমি খালাকে ডেকে নিয়ে এস।

ফাহমিদা মাকে ডাকতে যেতে মালেক খাট থেকে নেমে বাথরুম থেকে এসে জামা প্যান্ট পরতে লাগল।

একটু পরে মেয়ের সঙ্গে শাকেরা খানম এসে তাকে জামা প্যান্ট পরতে দেখে বললেন, তুমি কি এক্ষুণি চলে যাবে না কি? তা হচ্ছে না বাবা। খালার বাড়ী এসেছ, কয়েক দিন বেড়াও। তারপর না হয় যাবে। কতদিন তোমাকে দেখিনি। তোমার খালু শুনলে রাগ করবে।

মালেক বলল, আমি এক্ষুণী চলে যাচ্ছি আপনাকে কে বলল? মুন্সীগঞ্জে যাব। আমি তো কয়েকদিন থাকব বলে মাকে বলে এসেছি।

শাকেরা খানম বললেন, তাই বল। আমি শুধু শুধু কি সব বললাম।

মালেক বলল, খালা, আমি বলছিলাম কি, ফাহমিদাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওতো মনে হয় কোথাও বড় একটা যায়নি। আমার সাথে গাড়ীতে করে ঘুরে আসুক।

শাকেরা খানম শুনে খুব খুশী হলেন। উনি তাইই চান। যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে কোন বাধা বলে মনে করলেন না। তার উপর আপন খালাত ভাইবোন। বললেন, বেশ তো বাবা ওকে নিয়ে যাও। তারপর মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, যা তুই কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে আয়। আমি চা করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে দু'জন বেড়িয়ে আয়।

ফাহমিদা বলল, আব্বাকে বলতে হবে না?

শাকেরা খানম বললেন, সে এখন ঘুমোচ্ছে। তাকে আমি বলবখন। তোকে যা বললাম তাই কর। কথা শেষ করে তিনি চলে গেলেন।

মালেক ফাহমিদাকে বলল, দেখলে কিভাবে ম্যানেজ করলাম, এবার যাও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এস।

রূপসী ফাহমিদা রূপবান মালেককে দেখে স্বামীর কথা ভুলে গেল। নিজের রুমে গিয়ে মনের মত সাজল। কমলা রং-এর সালওয়ার কামিজ পরে এবং ঐ রং-এর ওড়নাটা ভাঁজ করে বুকের উপর ঝুলিয়ে মালেকের কাছে এসে বলল, কই চলুন।

মালেক তাকে দেখে উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলল, হাউ নাউস? সত্যি তোমার রুচিবোধ আছে। গায়ের রং এর সঙ্গে ম্যাচ করে জামা কাপড় পরেছ। তাতে তোমাকে আরো অনেক বেশি সুন্দরী দেখাচ্ছে। আমার চোখ ঝলছেসে যাচ্ছে। যদি বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী কর, তাহলে সিওর, তুমি শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর স্বর্ণপদক পাবে।

মালেকের মুখে তার রূপের প্রশংসা শুনে ফাহমিদার দেহে ও মনে অন্য একরকমের আনন্দের ও গর্বের অনুভূতির স্রোত বইতে লাগল। লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বলল, আপনি শুধু শুধু বাড়িয়ে বলে লজ্জা দিচ্ছেন।

মালেক এগিয়ে এসে তার চিবুক ধরে মুখটা তুলে বলল, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না।

ফাহমিদা তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, হয়েছে হয়েছে, অত আর রূপের প্রশংসা করতে হবে না। যাবেন তো চলুন।

মালেক বলল, হ্যাঁ চল।

সেদিন তারা মুন্সীগঞ্জে দর্পনা হলে 'শক্তি' বই দেখল। তারপর একটা হোটেলে ঢুকে চা নাস্তা খেয়ে মার্কেট করতে গেল। মালেক খালার জন্য ব্লাউজের পীস সহ শাড়ী, খালুর জন্য পাজামা পাঞ্জাবীর কাপড় ও ফাহমিদার চয়েস মত থ্রীপীসের সালওয়ার কামিজ এবং অনেক রকমের প্রসাধনী সামগ্রী কিনল। ফেরার পথে ফাহমিদাকে জিজ্ঞেস করল, জিনিসগুলো তোমার পছন্দ হয়েছে?

ফাহমিদা মালেককে যত জানছে তত তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। স্বামীর কথা যে মনে পড়ছে না, তা নয়। তবে তার কথা মনে স্থায়ী হচ্ছে না। কেবলই তার মনে

হচ্ছে, কোথায় দরিদ্র শামী আর কোথায় বিত্তবান মালেক? মালেককে দেখে এবং তার কথাবার্তায় সে মুগ্ধ হয়েছে। এখন তার খরচের বহর দেখে আরো বেশি মুগ্ধ হল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মালেক বলল, কিছু বললে না যে?

ফাহমিদা এতক্ষণ ঐসব ভাবছিল। বলল, সবকিছু তো দামী জিনিস। পছন্দ হবে না কেন? তারপর কপটতার ভান করে বলল, শুধু শুধু এত খরচ করতে গেলেন কেন?

মালেক হেসে উঠে বলল, এ আর কটাকা খরচ করলাম। যদি তোমার সঙ্গে আমার..বলে থেমে গিয়ে তার মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ী চালাতে লাগল।

ফাহমিদা লজ্জারাঙা হয়ে বলল, থেমে গেলেন কেন? কথাটা শেষ করুন।

মালেক আর একবার চেয়ে তার লজ্জারাঙা মুখ দেখে এবং তার কথা শুনে ফাহমিদার মনের খবর একটু আন্দাজ করতে পারল। তবু বলল, বললে তুমি মাইণ্ড করতে পার।

ফাহমিদা বলল, মাইণ্ড করব কেন? আপনি বলুন।

তার কথা শুনে মালেকের সাহস বেড়ে গেল। বলল, তোমাকে যদি বিয়ে করতে পারতাম, তাহলে দেখতে, তোমার জন্য কত হাজার হাজার টাকা খরচ করতাম।

মালেকের কথা শুনে ফাহমিদা বুঝতে পারল, সে এখনো তাহলে জানে না, তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে। হঠাৎ তার শামীর কথা মনে পড়ল। শামী এখনো ছাত্র। পড়াশুনা শেষ করে কবে সে উপযুক্ত হবে তার কোন ঠিক নেই। তাছাড়া তার বাবার কি এমন আছে, যা সে আমার পিছন খরচ করবে? তার উপর তারা যা গোঁড়া ধার্মিক? ঘর থেকে মেয়েদের বোরখা ছাড়া বেরোতে দেয় না। শামীর কাছ থেকে শুধু ভালবাসা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। শুধু ভালবাসা নিয়ে কেউ কি সুখী হতে পারে?

ফাহমিদা কিছু বলছে না দেখে মালেক বলল, দেখলে তো, আমার কথা শুনে মাইণ্ড করলে?

ঃ আমি মাইণ্ড করেছি বুঝলেন কি করে?

ঃ তা না হলে কিছু বলছ না কেন?

ঃ আমার মুখ দেখে কি তাই মনে হচ্ছে?

ঃ তা অবশ্য হয়নি। তবু তোমার মুখ থেকে কিছু শুনার আশা করেছিলাম।

ঃ না মাইণ্ড করিনি। পুরুষেরা যত তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা বলতে পারে, মেয়েরা তা পারে না। আচ্ছা, আপনি এসেই কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিয়ের কথা বলে ফেললেন; কিন্তু ভেবেছেন কি, আমি বড় হয়েছি, লেখাপড়া করেছি। আমারও তো পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে?

ঃ অফকোর্স। জান আমেরিকার লোকেরা বেশ আনন্দে আছে। ছেলেমেয়ে যাকে পছন্দ করছে তাকে বিয়ে করছে। কিছুদিন সংসার করার পর কোন কারণে মনোমালিন্য হলে, ইচ্ছা মত ডিভোর্স নিয়ে আবার পছন্দ মত বিয়ে করছে। দারুণ ইন্টারেষ্টেড ব্যাপার তাই না?

শামী একদিন ফাহমিদার সঙ্গে উন্নতশীল দেশের আলোচনা করার সময় সে সব দেশের নারী স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুফল ও কুফল বলেছিল। তখন ফাহমিদা বুঝতে পেরেছিল, নারী স্বাধীনতা মানে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নয়। আরো বুঝতে পেরেছিল, এই অবাধ মেলা মেশার ফলে ঐসব দেশের মানুষ দাম্পত্য জীবনে ভীষণ অসুখী এবং সে সব দেশে বছরে কয়েক লক্ষ অবৈধ সন্তান জন্মাচ্ছে। এখন মালেকের কথা শুনে শামীর কথা মনে পড়ল। বলল, যতই ইন্টারেষ্টেড হোক, আমার মনে হয়, এটা ঠিক নয়। কারণ এর ফলে কোন দাম্পত্য জীবন যেমন দীর্ঘস্থায়ী হয় না তেমনি সুখেরও হয় না।

মালেক বলল, তোমার কথা অবশ্য ঠিক। তবে সে সব দেশের লোকেরা ঐসব নিয়ে চিন্তা করে না। তারা ধর্ম-টর্মও তেমন মানে না। সেক্সকে তারা দৈহিক ক্ষুধা মনে করে। সেটা যেভাবেই হোক তারা মিটিয়ে নেয়। তাতে তারা পাপ বোধ করে না। যাকগে বাদ দাও ওসব কথা। ওদের দেশে যেটা প্রচলন, আমাদের দেশে তা অপরাধ।

ঃ তাতো বটেই। আপনি কোনটাকে ভাল মনে করেন?

ঃ আমার ভালমন্দের কি দাম আছে বল। অপরাধবোধ নিজের কাছে। এক জনের যা ভাল, অন্যজনের কাছে তা মন্দ। তবে ধর্ম যারা মেনে চলে তাদের কথা আলাদা।

ঃ তুমি কি ধর্ম বিশ্বাস কর না?

ঃ বিশ্বাস যে একবারে করি না তা নয়। তবে ধর্ম সম্বন্ধে যেমন কিছু জানি না তেমনি মেনেও চলি না। তুমি কি ধর্মের সবকিছু মেনে চল?

ঃ আমি তোমার মত ধর্ম সম্বন্ধে বেশি কিছু না জানলেও কিছু কিছু জানি। সেসব মেনে না চললেও বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হতে হলে, ধর্মের প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে চরিত্র গঠনের জন্য ধর্মই প্রধান হাতিয়ার।

ঃ তুমি তো দেখছি মনিষীদের মত কথা বলছ। আমার মতে ধর্ম বুড়ো বয়সের ব্যাপার। মানুষ যখন কর্ম ক্ষমতা হারায় তখন বসে শুয়ে ধর্ম কর্ম করবে। যুবক বয়সে ওসব মানায় না। সেই সময় উপার্জন করবে এবং জীবনকে পূর্ণরূপে ভোগ করবে। ভোগ করার জন্যই তো জীবন। যে জীবনে কোন কিছু ভোগ করতে পারল না, তার জীবনটাই বৃথা।

মালেকের কথা শুনে ফাহমিদার শামীর কথা মনে পড়ল। সে একদিন তাদের তিনজনকে ধর্মকর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিল। বলল, আমি আপনার কথা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। একজনের কাছে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কথা শুনেছিলাম। সে বলেছিল, যা সত্য ও ন্যায় সেটাই ধর্ম। ধর্মের মধ্যে কোন মিথ্যা বা অন্যায় থাকবে না। ধর্মের জ্ঞান না থাকলে যেমন ন্যায় অন্যায় বিচার করার ক্ষমতা কারো থাকে না, তেমনি অপরাধ বোধের জ্ঞানও জন্মায় না। আর ভোগের মধ্যে নাকি সুখ শান্তি নেই, ত্যাগের মধ্যে আছে। শুধু ভালভাবে জীবন যাপন করার জন্য যতটুক প্রয়োজন, ততটুকু ভোগ কর। বাকিটা অন্যকে ভোগ করার জন্য সুযোগ দাও। অতিরিক্ত ভোগ বিলাসে মানুষ নাকি অমানুষ হয়ে যায়। বিবেক বুদ্ধি দয়া-মায়া হারিয়ে ফেলে। ভোগ বিলাসের নেশা না কি এমন, যত পাবে তত পাবার নেশা বেড়ে যাবে।

আর বুড়ো বয়সে ধর্ম-কর্ম করায় যা বললেন, তাও ঠিক নয়। যুবক বয়সটাই সব কিছু করার সময়। সেই বয়সে অন্যায়ের পথে থেকে বুড়ো বয়সে সৎপথে থেকে

লাভ কি? তখন তার কর্ম ক্ষমতাই বা কত টুকুথাকবে। সবকিছুর সঙ্গে যুবক বয়সেই ধর্ম কর্ম মেনে চলা উচিত।

মালেক বলল, তুমি যার কাছে এইসব কথা শুনেছ, সে নিশ্চয় ধার্মিক। আর ধার্মিকরা নিজেদের ভোগ-বিলাস ও ভালমন্দের চেয়ে অন্যের চিন্তা বেশি করে। এসব কথা এখন থাক। পরে একসময় আলোচনা করা যাবে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, উত্তর দেবে তো?

ঃ কেন দেব না? উত্তর জানা থাকলে নিশ্চয় দেব।

ঃ আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?

ঃ কেমন আবার? ভাল।

ঃ শুধু ভাল বললে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ কি না বলতে হবে।

ঃ যদি বলি অপছন্দ, তাহলে নিশ্চয় দুঃখ পাবে তাই না? কথাটা ফাহমিদা এমনভাবে বলল, তাতে করে দু'জনেই হেসে উঠল।

মালেক বলল, ইয়ার্কি রেখে আসল কথাটা বল।

ফাহমিদা বলল, আমি বুঝি আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি করার জন্য এসেছি?

মালেক বলল, তুমি তো আসনি, আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি। এবার না বললে মনে কষ্ট পাব।

ফাহমিদা কি বলবে ভাবতে লাগল; মালেককে তার খুব ভাল লাগলেও বারবার শামীর কথা মনে পড়ছে। সেই সাথে এই কথাও মনে পড়ছে, শামীর সঙ্গে মা-বাবা কিছুতেই বিয়ে দেবে না। তাছাড়া মালেকের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। এই কথা জানার পর শামীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য তার অনুশোচনা হতে লাগল। তাকে ভালবাসলেও বিয়ে করা সম্ভব নয়। কবে সে মানুষের মত মানুষ হবে, ততদিন মা-বাবা কি তার বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে?

ফাহমিদা কিছু বলছে না দেখে মালেক বলল, কি ভাবছ? আমাকে কি পছন্দ.....

ফাহমিদা তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বলল, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। এ ব্যাপারে মা-বাবার মতামতই আমার মত।

ঃ তবু তোমার নিজস্ব মতটা বললে খুশী হতাম।

ঃ আমার কথাতেই আপনার বুঝে নেয়া উচিত ছিল। তবু বলছি, আপনার মত ছেলেকে সব মেয়েরা পছন্দ করবে।

ঃ তুমি খুব বুদ্ধিমতী।

ঃ আপনি আরো বেশি।

ঃ তাই যদি হয়, বুদ্ধি খাটিয়ে তোমাকে বিয়ে করবই।

ঃ সেটা আপনার ইচ্ছা।

ঃ আর তোমার কি ইচ্ছা?

ঃ আমার ইচ্ছার কথা বলব না। কারণ আমাকে তো আর বুদ্ধি খরচ করে বিয়ে করতে হচ্ছে না।

মালেক হাসতে হাসতে বলল, না সত্যি তুমি খুব বুদ্ধিমতী। ভাবছি, বুদ্ধিতে তোমার সাথে কোন দিন পারব কিনা।

ফাহমিদা আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। তখন তার মনে আবার শামীর কথা ভেসে উঠল। ভাবল, শামী যতই দুঃখ পাক তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হবে। কিভাবে করবে তা চিন্তা করতে লাগল।

মুন্সীগঞ্জ থেকে আলদি বাজার মাত্র তিনচার মাইলের পথ। তারা ততক্ষণে বাড়ী পৌঁছে গেল।

শাকেরা খানম মালেকের মার্কেটিং দেখে খুব খুশী হলেন। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে বললেন, শুধু শুধু এতটাকা খরচ করতে গেলে কেন বাবা?

মালেক হাসিমুখে বলল, খালা আম্মা কি যে বলেন, আপনাদের ছেলে বিদেশ থেকে যদি নিয়ে আসত, তাহলে আপনারা কি খুশী হতেন না? মনে হচ্ছে, আমাকে ছেলের মতন মনে করেন না।

শাকেরা খানম তাড়াতাড়ি করে বললেন, না বাবা না, তা নয়। তুমি তো আমাদের নিজেদের ছেলেই। এমনি কথাটা বলেছি। তুমি আবার মনে কিছু করো না।

মালেক বলল, মনে কিছু করব কেন? তাই জানি বলে তো এগুলো নিয়ে এলাম। দেখে বলুন, পছন্দ হয়েছে কিনা।

শাকেরা খানম সবকিছু খুলে দেখে বললেন, এত দামী জিনিস এনোছো, পছন্দ তো হবেই। তাছাড়া ছেলে দামীই দিক আর অদামীই দিক, মা-বাবার কাছে সব কিছুই ভাল। দোয়া করি "আল্লাহ তোমার রুজী রোজগারে বর্কত দিক। তোমার হায়াৎ দারাজ করুক।"

আরো দু-তিন থেকে মালেক বাড়ী ফিরে এল।

ছয়

এদিকে শামী ফাহমিদার সঙ্গে দেখা করার কোন উপায় বের করতে না পেরে একদিন জোবেদাদের বাড়ীতে এল। তাদের সদরের সামনে জোবেদার ছোট ভাই লিটন কয়েকটা ছেলের সঙ্গে খেলা করছিল। সে শামীকে চেনে। তাকে দেখে খেলা বন্ধ করে তার দিকে এগিয়ে এল।

শামী তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

ঃ লিটন।

ঃ লিটন আবার একটা নাম হল নাকি? ভাল নাম বল।

ঃ মোসারেফ হোসেন।

ঃ বাহ! এইতো বেশ সুন্দর নাম। তুমি জোবেদাকে চেন?

ঃ জ্বী চিনি। সে আমার বড় আপা!

ঃ ও আচ্ছা, তুমি আমাকে কি চেন?

শামী যেদিন প্রথমবার তাদের বাড়ীতে এসেছিল সেদিন চলে যাবার পর লিটন জোবেদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বড় আপা উনি কে? জোবেদা বলেছিল উনি শামী ভাই, উত্তর পাড়ায় বাড়ী। তারপর তাকে আরো দু-তিনবার আসতে দেখেছে।

এখন শামীর কথা শুনে বলল, আপনাকে চিনব না কেন? আপনি তো শামী ভাই। আগেও কয়েকবার আপার কাছে এসেছেন।

শামী এত ছোট ছেলের কথা শুনে অবাক হল। মৃদু হেসে বলল, তোমার আপাকে একটু ডেকে দাও তো।

লিটন ছুটে বাড়ীর ভিতরে জোবেদার কাছে গিয়ে বলল, বড় আপা, শামী ভাই এসেছেন, তোমাকে ডাকছে।

জোবেদা ছোট ভাইয়ের একটা হাত ধরে বলল, বড়দের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হলে আপনি করে বলতে হয় বুঝলে? বলবে শামী ভাই এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন।

লিটন মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা। তারপর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে সাথীদের কাছে চলে গেল।

জোবেদা হাতের কাজ ফেলে সদরে এসে দেখল, শামী দাঁড়িয়ে আছে। সালাম দিয়ে বলল, শামী ভাই যে, কেমন আছেন? আসুন ভিতরে এসে বসুন।

শামী সালামের উত্তর দিয়ে ভিতরে এসে বসে বলল, আমি এক রকম আছি। তুমি কেমন আছ বল।

জোবেদা বলল, মেয়েদের ভাল থাকা আর না থাকা একই কথা। পড়াশুনা বন্ধ করে মা বাবার সংসারে খেটে মরছি। কিছুদিন পর স্বামীর সংসারে গিয়ে আবার সারাজীবন খেটে মরতে হবে। এই তো মেয়েদের জীবন, তাইনা শামী ভাই?

শামী তার কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে বলল, কি ব্যাপার? তোমার আবার কিহল? এ রকম করে কোন দিন বলিনি তো?

জোবেদা হেসে উঠে বলল, না শামী ভাই, আমার কিছু হয়নি। কথাটা হঠাৎ মনে এল, তাই বলে ফেললাম।

শামী বলল, তাই বল। আমি মনে করেছিলাম, কোন কিছু আবার হল কিনা। যাক এখন আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

শামী ভাই কি কাজ করতে বলবে তা জোবেদা অনুমান করতে পারল। তবু বলল, বলুন কি কাজ সাধ্যমত চেষ্টা করব।

শামী বলল, ফাহমিদাকে একটু ডেকে নিয়ে আসতে হবে।

জোবেদা হেসে উঠে বলল, ঠিক আছে, চা করে নিয়ে আসি, চা খান। ততক্ষণে আমি ফাহমিদাকে এনে হাজির করব। তারপর সে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

একটু পরে জোবেদা এক কাপ চা ও একবাটি সর্ষের তেল মাখান মুড়ি এবং এক গ্লাস পানি এনে টেবিলের উপর রেখে বলল, আপনি খান, আমি যাব আর আসব। কথা শেষ করে সে বেরিয়ে গেল।

শামী চা মুড়ি খেতে খেতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

জোবেদা ফাহমিদাদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বলল, তোকে এক্ষুণী আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ঃ কোথায়?

ঃ কোথায় আবার, আমাদের বাড়ীতে।

ঃ কেন?

ঃ শামী ভাই তোর সাথে দেখা করতে এসেছেন।

শামীর কথা শুনে ফাহমিদা একবার চমকে উঠে চুপ করে রইল।

ঃ কিরে শামী ভাইয়ের কথা শুনে চমকে উঠলি কেন? আর চুপ করেই বা রয়েছিস কেন? প্রেমিকের খবর প্রেমিকার কাছে নিয়ে এলাম পুরস্কার দিবি না?

পুরস্কার পরে দেব। শামী এসে ভালই হয়েছে। তার সঙ্গে আজ ফাইন্যাল বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

ঃ তুই এভাবে কথা বলছিস কেন? শামী ভাইকে দেখে মনে হল, তোকে দেখার জন্য পাগল হয়ে রয়েছে। তোদের মধ্যে কি কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে?

ঃ তোর কথাটা কিছুটা সত্য। আব্বা-আম্মা আমার খালাত ভাই মালেকের সাথে বিয়ে দেবার জন্য সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। মালেক শামীর চেয়ে সব দিক থেকে শ্রেয়। তাদের বাড়ী গাড়ী আছে। মালেক আমেরিকায় চাকরি করে। বিয়ে করে আমাকে সেখানে নিয়ে চলে যাবে। সূর্যের সামনে চাঁদ যেমন, মালেকের পাশে শামী তেমন। জেনে শুনে শামীর জন্য মালেককে হারাতে পারব না। তাছাড়া আব্বার মতের বাইরে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই সেকথা শামীকে জানিয়ে আজ আমি মুক্ত হয়ে যাব।

ফাহমিদার কথা শুনে জোবেদা যেন আকাশ থেকে পড়ল! সামলে নিয়ে বলল, তাহলে এতদিন তুই শামী ভাইকে ভালবাসলি কেন? তিনি যে তোকে ভীষণ ভালবাসে, তোকে না হলে সে যে বাঁচবে না, আর বাঁচলেও পাগল হয়ে যাবে, সে কথা তুইতো কতবার আমাকে বলেছিস। আর তুইও তো তাকে ভীষণ ভালবাসিস। আমিও তোদের দু'জনের গভীর ভালবাসার কথা জানি। তুই এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবি? তোর কাছে গাড়ী বাড়ী আমেরিকা বড় হল? এতবছরের ভালবাসার কোন মূল্য নেই। তোর মত সার্থপর মেয়ে জীবনে আর কাউকে দেখিনি।

ফাহমিদা বলল, তোর মনে যা চায় তা বলতে পারিস। কিন্তু আমি কিছুতেই শামীকে গ্রহণ করতে পারব না। আজ থেকে তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। সে কথা তাকে জানিয়ে দেব। শামীর কি আছে? কি দিয়ে সে আমাকে সুখী করবে?

জোবেদা বলল, তুই যে এত নির্দয় তা জানতাম না। যাই হোক চল, তোর কথা তুই তার সামনেই বলবি।

তারপর তারা শামীর কাছে এল।

ফাহমিদাকে দেখে শামী সালাম দিল।

ফাহমিদা সালামের উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে রইল।

তাই দেখে জোবেদা সালামের উত্তর দিয়ে বলল, শামী ভাই আপনারা কথা বলুন। আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি। এই কথা বলে সে রুমের বাইরে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল।

জোবেদা চলে যাবার পর শামী বলল, এতদিন তোমার কোন খবর না পেয়ে কি ভাবে দিন কেটেছে, তা আল্লাহ পাক জানেন। তোমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। তোমাকে সালাম দিলাম, তার উত্তরও দিলে না। এখন আবার চুপ করে রয়েছ। হেতুটা কি বলবে? তবু যখন ফাহমিদা কোন কথা বলল না তখন আবার বলল, তোমার কাছে আমি কোন অপরাধ করেছি বলে মনে হয়নি। যদি অজান্তে

করেও থাকি, তাহলে ক্ষমা চাইছি। তবু চুপ করে থেক না। মুখ তুলে আমার দিকে চাও, প্লীজ। কি কারণে তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ বল ফাহমিদা বল।

আজ ফাহমিদার কাছে শামীর কথগুলো অসহ্য মনে হতে লাগল। মুখ তুলে শামীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, তোমার বকবকানি থামাও। এইসব শোনার জন্য আমি আসিনি। যে জন্য এসেছি তা বলছি শোন, তোমাকে আমি আগে ভালবাসতাম। তাই তখন তোমার সঙ্গে কিছুদিন প্রেম প্রেম খেলেছি। এখন আর তোমাকে ভালবাসি না। তাই তোমার সঙ্গে এতদিন যোগাযোগ করিনি। আজও আসতাম না। এই কথা বলার জন্য এসেছি। এখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আর জেনে নাও, কিছু দিনের মধ্যে আমার খালাত ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করা আকাশ কুসুম ভাবার নামান্তর। আমার কথা শুনে তুমি হয়তো দুঃখ পাচ্ছ; তা অবশ্য পাবারই কথা। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছ কি, তুমি আমার উপযুক্ত কি না? তুমি একদিন বলেছিলে, উপযুক্ত হয়ে আমাকে বিয়ে করবে। কবে উপযুক্ত হবে? ততদিনে যে আমি বুড়ী হয়ে যাব, সেকথাও কি কখনো ভেবেছ? তুমি না ভাবলেও আমি ভেবেছি। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আব্বা-আম্মার নির্বাচিত পাত্রকে বিয়ে করতে সিদ্ধান্ত নিলাম। আর সে কথা তোমাকে জানান উচিত মনে করে জানালাম।

ফাহমিদার কথা শুনে শামীর মনে হল, তার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রঘাত হল। সে মুক ও বধির হয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে রইল। ফাহমিদা এরকম কথা বলবে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মনে হল, সে স্বপ্ন দেখছে না তো? একহাত দিয়ে অন্য হাতে চিমটি কেটে বুঝতে পারল, স্বপ্ন নয় বাস্তব। কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে থেকে নিজেকে সামলে নিল। তরপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এতদিন সেকথা জানালে না কেন? আমি তো অনেক আগে তোমার মতামত জানার জন্য সুদীর্ঘ একটা পত্র দিয়েছিলাম। সেদিন তুমি কি উত্তর দিয়েছিলে, আর আজ আবার এসব কি বলছ, তা কি একবারও ভেবে দেখেছ? তোমার খালাত ভাইয়ের সাথে বিয়ের কথা নিশ্চয় অনেক আগে হয়েছে। তারপরও তোমার নিখুঁৎ অভিনয়ের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু কেন এমন করলে ফাহমিদা? আমাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিলে কেন? তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে পাবার জন্য নির্ঘাৎ মৃত্যু জেনেও আমি গাছ থেকে লাফ দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করব না? তবু এমন কাজ করতে পারলে? তোমাকে আমাকে নিয়ে কলেজে ও বন্ধু মহলে কত রকমের কথা হয়েছে। তোমার জন্য অনেকের কাছ থেকে অনেক অপমান সহ্য করেছি। তবু আমি সেসব গায়ে মাখিনি। তোমার ভালবাসার পানিতে অবগাহন করে ধুয়ে মুছে ফেলেছি। তোমার খালত ভাইকে যখন থেকে ভাল লাগল তখন যদি জানাতে, তাহলে আজ ডেকে পাঠাতাম না। যাই হোক, এতদিন আল্লাহ পাক তোমাকে সুমতি দান করেছেন, সেজন্য তাঁর দরবারে জানাচ্ছি শতকোটি শুকরিয়া, দোয়া করি তিনি যেন তোমাকে প্রত্যেকটা কাজ করার পূর্বে চিন্তা করার তওফিক দান করেন। বিদায় লগ্নে একটা কথা বলে যাই, যেদিন থেকে তোমাকে ভালবেসেছিলাম সেদিন তোমাকে যে কথা বলেছিলাম, আজ আবার সেই কথাই বলছি; আমার ভালবাসার মধ্যে কোন মোহ বা

সার্থ নেই। যদি থাকত, তাহলে সে সব পূরণ করার সুযোগ অনেক পেয়েছিলাম। তোমার মন একাধিক হতে পারে। সেই জন্য তুমি একাধিক লোককে ভালবাসতে পার। কিন্তু আমার মন একটা। সেই মন সম্পূর্ণরূপে তোমাকেই দান করেছি। অন্য মেয়েকে দেবার মত আমার আর মন নেই। তুমি আমাকে বিদায় দিলে ভাল কথা। কিন্তু আমি তোমাকে বিদায় দিতে পারব না। তোমার জন্য আমার মনের দুয়ার চিরকাল খোলা থাকবে। আমার জীবদ্দশায় তুমি যে কোন সময় আমার কাছে এলে, আমি তোমাকে সানন্দে গ্রহণ করব। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনে আর কোন দিন এই ভগ্নহৃদয় নিয়ে তোমার কাছে ভালবাসার দাবি করব না। আল্লাহ পাক যেন তোমাকে সুখ শান্তি দান করেন এবং তোমার সার্বিক সফলতা দান করেন, সেই কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আসি, খোদা হাফেজ বলে শামী হন হন করে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। তার মাথায় তখন তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। কি করে সে বাড়ী পর্যন্ত এল, তা সে বুঝতে পারল না। নিজের রুমে এসে বিছানায় শুয়ে চোখের পানিতে বালিস ভিজাতে লাগল।

ফাহমিদার এহেন কঠোর কথা এবং শামীর করুন কথাগুলো শুনে জোবেদার দু'চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। শামী চলে যাবার পর চোখ মুখ মুছে ঘরে ঢুকে ফাহমিদাকে বলল, আমি দরজার আড়াল থেকে তোদের সব কথা শুনেছি। তুই এত নিষ্ঠুর? তোর মন এত পাষাণ? সরলমনা শামী ভাইকে এই রকম কঠোর আঘাত করতে পারলি? তারমত ভাল ছেলে আমি তার দ্বিতীয় দেখিনি। মনে করেছিলাম, শামী ভাই হয়তো তোর কাছে কোন অন্যায় করেছে। কিন্তু এখন বুঝলাম, আমার ধারণা ভুল। তোর মনে যদি তাই ছিল, তবে কেন আগে তাকে জানাসনি? কেন তার সঙ্গে এতদিন প্রেমের খেলা খেলে বিষাক্ত ছোবল মারলি? শামী ভাই কি তোর বিষাক্ত ছোবল সহ্য করতে পারবে? তুই পাষাণী। তুই মেয়েদের মধ্যে কলংকিনী। আজ থেকে তোর সাথে আমার কোন সর্ম্পক নেই। এক্ষুণী তুই এখান থেকে চলে যা। আর কোন দিন আসবি না। তারপর সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ফাহমিদা বলল, ঠিক আছে, আজ থেকে তোর সাথে আমারও কোন সম্পর্ক নেই। আর তোদের বাড়ীতে আসারও প্রত্যাশী আমি নই। তবে যাবার আগে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, বলি শামীর জন্য তোর এত দরদ কেন? তার কি হবে না হবে, তা নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন? এত কান্নাকাটিই বা করছিস কেন? তাহলে কি বুঝবো, তুই তাকে ভালবাসিস? যদি তাই হয়, তাহলে তো তোর খুশী হবার কথা। আমি সরে গিয়ে তোর লাইন ক্লিয়ার করে দিলাম।

জোবেদা কান্না থামিয়ে কর্কশকণ্ঠে বলল, তোর মুখে আর ভালবাসার কথা শোভা পায় না। অমন কথা তোর মুখে আনা উচিতও হয় না। তারপর স্বর পাল্টে বলল, শামী ভাই তোকে মনপ্রাণ উজাড় করে ভালবেসেছিলেন। আর তুইও তাকে গরীব জেনে ভালবেসেছিলি। তোর খালাত ভাইকে দেখে মুগ্ধ হয়ে এবং তার অনেক টাকা পয়সা আছে জেনে শামী ভাইয়ের সঙ্গে তুই বেঈমানী করলি। এখন আবার নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছিস। শামী ভাই তোকে ছাড়লেও আল্লাহ ছাড়বে না। তিনি ন্যায় বিচারক। বেঈমানী করার ফল তোকে একদিন না একদিন ভোগ করতেই হবে। তোর কথা শুনে বলতে বাধ্য হচ্ছি, শামী ভাই যদি তার

জুতোর ধুলোর একটা কণার মত আমাকে ভালবাসত, তাহলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতাম। তুই যে কতবড় ভুল করলি, তা একদিন বুঝতে পারবি।

ফাহমিদা রাগের সঙ্গে বলল, শামীকে যদি তাই ভাবিস, তাহলে এবার প্রেম নিবেদন করে তার ভগ্নহৃদয় জোড়া লাগাবার চেষ্টা কর।

জোবেদাও রাগের সাথে বলল, তোকে আর দালালী করতে হবে না। তোর মুখ আমি আর দেখতে চাই না। তুই এই মুহূর্তে চলে যা। এই কথা বলে সে নিজেই সেখান থেকে চলে গেল।

ফাহমিদা রাগে ও অপমানে ফুলতে ফুলতে বাড়ী ফিরে চলল।

এদিকে শামী বাড়ীতে এসে সেই যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল, শুধু নামায পড়ার সময় ছাড়া সারাদিন আর উঠল না। খাওয়া-দাওয়াও করল না।

তার মা মাসুমা বিবি ছেলেকে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে দেখে কয়েকবার এসে জিজ্ঞেস করেও একটা কথা বলাতে পারেননি। কিছু খাওয়াতেও পারেননি। এভাবে দু'দিন কেটে যাবার পর মাসুমা বিবি ছোট দেওরের ছেলে জাহিদকে বললেন, তোর ভাইয়ার বন্ধু রায়হানকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি আমি ডেকেছি।

জাহেদের বয়স দশ এগার। ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে রায়হানকে চিনে। তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে সালাম দিয়ে বলল, চাচী আম্মা আপনাকে আমার সাথে যেতে বলেছে।

রায়হান সালামের উত্তর দিয়ে বলল, কেন ডেকেছে বলতে পার? তোমাদের বাড়ীর সব খবর ভাল তো?

জাহেদ বলল, সবাই ভাল আছে। তবে শামী ভাই আজ তিন দিন বিছানা ছেড়ে উঠে নাই। কিছু খায়ও না। শুধু শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। চাচী আম্মা কত করে জিজ্ঞেস করেছে, কি হয়েছে বল। শামী ভাই কোন কথাই বলছে না।

রায়হান বুঝতে পারল, নিশ্চয় ফাহমিদা তার ভালবাসা ফিরিয়ে দিয়েছে। বলল, একটু অপেক্ষা কর, আমি হাত পা ধুয়ে গায়ে জামা দিয়ে আসি। সে তখন বাগানে কামলাকে নিয়ে কাজ করছিল। তারপর কামলাকে বলল, তুমি কাজ কর, আমি একটু উত্তর পাড়ায় যাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে এসে রায়হান জাহেদকে নিয়ে তাদের বাড়ী রওয়ানা দিল।

বাড়ীতে পৌঁছাবার পর জাহেদ তাকে বৈঠকখানায় বসতে বলে ভিতরে গিয়ে চাচী আম্মাকে বলল, ভাইয়ার বন্ধু এসেছে।

মাসুমা বিবি বৈঠকখানায় এলেন।

রায়হান দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বলল, আমাকে ডেকেছেন কেন চাচী আম্মা?

মাসুমা বিবি বললেন, গত তিন দিন থেকে শামী শুয়ে শুয়ে শুধু কাঁদছে। কোন কিছু খাওয়া-দাওয়াও করেনি। আমি কত করে বললাম, কি হয়েছে বল। তা যদি একটা রা করল। তুমি ওকে জিজ্ঞেস করত বাবা, কি জন্যে সে এরকম করছে। তোমার চাচাও বাড়ীতে নেই। কি যে করব, কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

রায়হান বলল, আমাকে আরো আগে খবর দিলেন না কেন? ঠিক আছে আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সবকিছু ব্যবস্থা করছি। শামী এখন কোথায়?

মাসুমা বিবি বললেন, তিনদিন পর আজ অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নাস্তা খাইয়েছি। তুমি আসবার একটু আগে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় আম বাগানে গেছে। তারপর জাহেদকে বললেন, যাতো বাবা রায়হানকে আম বাগানে নিয়ে যা।

শামীদের একটা বড় আম বাগান আছে। সেখানে অনেক পদের আম গাছ। শামীর সঙ্গে রায়হান কতদিন সেই আমবাগানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে গল্প করেছে। মাসুমা বিবির কথা শুনে বলল, জাহেদকে যেতে হবে না, আমি একাই তার কাছে যাচ্ছি। তারপর সে যেতে উদ্যত হল।

মাসুমা বিবি বললেন, একটু বস, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে তারপর যেও।

রায়হান যেতে যেতে বলল, মাফ করবেন চাচী আম্মা, আমি কিছুক্ষণ আগে চা-নাস্তা খেয়েছি। আগে শামীর সঙ্গে দেখা করি, তারপর না হয় খাব।

রায়হান আমবাগানে এসে দেখল, শামী একটা আমগাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। আর তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। এই দু'তিন দিনে তার চেহারা শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটো কোঠরে ঢুকে গেছে। কাছে এসে সালাম দিয়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, কিরে এখানে বসে কাঁদছিস কেন? তোর এরকম অবস্থা হল কি করে?

শামী চমকে উঠে চেয়ে সালামের উত্তর দিয়ে রায়হানকে জড়িয়ে ভিজে গলায় বলল, হেরে গেলাম দোস্ত হেরে গেলাম। আমি জীবনে হার কি জিনিস জানি না। কিন্তু ফাহমিদার কাছে হেরে গেলাম। তারপর ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

রায়হান যা বুঝার বুঝে গেল। বলল, তুই শিক্ষিত ছেলে হয়ে একটা মেয়ের কাছে হেরে গিয়ে কাঁদছিস, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। এটাকে তুই হার বলছিস কেন? তুই পুরুষ ছেলে। এক ফাহমিদার কাছে হেরে গেছিস তো কি হয়েছে? অমন কত ফাহমিদা তোকে পাবার জন্য হাঁ করে রয়েছে। তোর মত ছেলে আমাদের গ্রামে আর একটা আছে কিনা সন্দেহ। এখন কান্না থামা। কি হয়েছে বল।

শামী সামলে নিয়ে রায়হানকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুখ মুছল। তারপর সেদিন ফাহমিদার সাথে যেসব কথোপকথন হয়েছিল তা সব বলল।

রায়হান অনেক দিন আগেই জানত, ফাহমিদা একদিন না একদিন এরকম কথা বলবেই। তাই এখন শামীর কাছে তার কথা শুনে একটুও অবাক হল না। বলল, তুই এত লেখাপড়া করলি আর এটা জানিস না, মেয়েরা সুখের পায়রা? পায়রা যেমন স্বচ্ছল ও সুখী বাড়ীতে বাস করে, মেয়েরাও তেমনি স্বচ্ছল ও সুখী বাড়ীতে বাস করতে চায়। সেই বাড়ীতে যখন অভাব অনটন আসে পায়রা তখন অন্য সুখী বাড়ীতে চলে যায়। মেয়েরাও সংসারে অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট এলে স্বামী ও স্বামীর বাড়ীর সকলের সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে। অনেকে বাপের বাড়ী গিয়ে আর আসতে চায় না। তাই জেনেশুনে কোন মেয়ে গরীব ছেলেকে বিয়ে করতে চায় না। অবশ্য সব মেয়েরা যে এরকম তা নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায়। ফাহমিদা ঐ ধরনের মেয়ে। আল্লাহ পাক যা করেন সবার ভালর জন্য করেন। ফাহমিদাকে পেলে তুই সারা জীবন অশান্তি পেতিস। যাই হোক, যা হয়েছে ভালই হয়েছে, এবার তাকে তুই ভুলে যা। যে মেয়ে এতদিন তোর সাথে ভালবাসা করে আজ তার খালাত ভাইকে ভালবাসে, সে যে একটা জঘন্য ধরনের মেয়ে তা

তুই বুঝতে পারছিস না কেন? তুই আবার তার জন্য কান্নাকাটি করছিস। আমি হলে অমন মেয়েকে মন থেকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিতাম। সে খারাপ মেয়ে ভেবে তাকে তোর ভুলে যাওয়া উচিত। সে যদি তোকে ভালবেসেও অন্য ছেলেকে বিয়ে করতে পারে, তবে তুই অন্য মেয়ে বিয়ে করতে পারবি না কেন? তুইও একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কর।

শামী কাতর স্বরে বলল, ফাহমিদা অন্যকে বিয়ে করে সুখী হোক তাই আমি চাই। সে দুঃখ পেলে আমি আরো বেশি দুঃখ পাব। তুই ঐসব কথা আর বলবি না।

রায়হান বুঝতে পারল শামীর প্রেম পবিত্র। তাই ফাহমিদা বেঈমানী করলেও তাকে সুখী দেখতে চায়। বলল, তাই যদি হয়। তাহলে তুই এরকম করছিস কেন?

শামী বলল, ওকে গভীরভাবে ভালবাসতাম। তাই আঘাতটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। সেই ক্ষতের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

রায়হান বলল, তুইও তো হাদিস কালাম জানিস। আল্লাহ পাক যাকে ভালবাসেন তাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে পরীক্ষা করেন। যদি বান্দা সেই পরীক্ষায় ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে পাশ করতে পারে, তাহলে তাকে প্রিয় বান্দাদের মধ্যে সামিল করে নেন। তুই আল্লাহ পাকের কাছে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা চা। চল ঘরে চল। গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করবি। চাচী আম্মা বললেন, তুই নাকি এই কদিন খাওয়া দাওয়া না করে শুধু শুয়ে শুয়ে কেঁদেছিস?

শামী বলল, বললাম না আঘাতে খুব কাহিল হয়ে পড়েছি। তাই সামলাতে পারছি না। একটু আগে নাস্তা খেয়েছি। পরে গোসল করে ভাত খাব। তুই এখন যা। পরে আবার আসিস।

রায়হান আর কিছু বলল না। ফিরে এসে শামীর আম্মাকে বলল, চাচী আম্মা, আমি শামীকে অনেক বুঝিয়েছি। মনে হয় এবার ঠিক হয়ে যাবে। এখন আসি। পরে আবার আসব।

মাসুমা বিবি বললেন, তুমি একটু বস। তোমার জন্য চা করে রেখেছি, নিয়ে আসি। তারপর চা নিয়ে এসে রায়হানকে খেতে দিয়ে বললেন, ওর কি হয়েছে তোমাকে বলেছে?

রায়হান চিন্তা করল, ব্যাপারটা উনাদের জানান উচিত। জানার পর উনারা চিন্তা ভাবনা করে কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। কিভাবে কথাটা বলবে চিন্তা করতে লাগল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মাসুমা বিবি বললেন, যদি বলে থাকে, তাহলে নিশ্চিন্তে বলতে পার। আমাকে তো কিছুই বলছে না।

রায়হান বলল, শামী প্রায় পাঁচ বছর আগে থেকে একটা মেয়েকে ভালবাসত। মেয়েটিও শামীকে ভালবাসত। সেই মেয়েটি এখন তার খালাত ভাইকে ভালবাসে এবং তাদের বিয়ের কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেছে। তিন চারদিন আগে মেয়েটি সেকথা শামীকে জানিয়েছে। তাই শামী মনে ভীষণ আঘাত পেয়ে এরকম করছে।

মাসুমা বিবি খুব অবাক হয়ে বললেন, কই আমরা তো কিছুই বুঝতে পারিনি? তুমি কি মেয়েটিকে চিনো?

রায়হান বলল, জ্বী চিনি। দক্ষিণ পাড়ার আবসার উদ্দিনের মেয়ে। নাম ফাহমিদা। দু'বছর আগে আই. এ. পাস করে আর পড়েনি।

মাসুমা বিবি বললেন, আবসার উদ্দিন খুব ধনী লোক। তার মেয়ের সঙ্গে জেনেশুনে শামী ভালবাসা করতে গেল কেন? তাছাড়া ওদের ফ্যামিলির কেউ নামায রোযা করেনি। তারা অন্য সমাজের মানুষ। শামীর মত ছেলে এত বড় ভুল করতে পারল? ওদের কাছে প্রেম ভালবাসার কোন মূল্য নেই। ওরা শুধু বুঝে টাকা। টাকাকেই মনুষত্বের চাবিকাঠি মনে করে। শামীর আব্বা কিছুতেই ও বাড়ীর মেয়েকে বৌ করতে রাজী হতেন না। আল্লাহ্ পাক যা করেন ভালই করেন। তুমি শামীকে বলো, আমরা ভাল মেয়ে দেখে তার বিয়ে দেব। সে যেন ঐ মেয়েকে ভুলে যায়। ঐ মেয়ের জন্য আবার এত কান্নাকাটি? আমি আজই তোমার চাচাকে চিঠি লিখে বাড়ী আসতে বলব। যতশিঘ্রী পারি ওর বিয়ে দেব।

রায়হান বলল, আপনি খুব ভাল কথা বলেছেন। এখন আমি আসি, কামলা নিয়ে বাগানে কাজ করছিলাম। যাই দেখি কি করছে। কাল পরশু আবার আসব।

মাসুমা বিবি বললেন, হ্যাঁ বাবা তাই এস। এসে শামীকে বিয়ে করার জন্য বুঝিয়ে বলো।

রায়হান বলল, আজও বুঝিয়েছি। আবার এসে বোঝাব। তারপর সালাম দিয়ে চলে গেল।

শামী নাস্তা খেয়ে সেই যে আমবাগানে গিয়ে বসেছিল, একেবারে জোহরের আযানের সময় বাড়ীতে এল। তারপর গোসল করে মসজিদে নামায পড়তে গেল। নামাযের পর কেঁদে কেঁদে মোনাজাত করল, "হে রহমানুর রহিম, তোমার দয়া ব্যতীত কোন মানুষ একটা নিঃশ্বাস নিতে পারত না। তুমি যেমন দয়ার সাগর তেমনি প্রেমের সাগর। দুনিয়ার সাগরের কিনারা আছে। কিন্তু তোমার প্রেমের সাগরের কোন কিনারা নেই। তুমি মানুষের মধ্যেও সেই প্রেমের কিঞ্চিতের বঞ্চিত দান করেছ। তাই মা-বাপ তার সন্তানকে ভালবাসে, সন্তানও তার মা বাপকে ভালবাসে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাই-বোনের মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে, এমনকি সমস্ত মানব-মানবীর মধ্যেও তুমি প্রেমের বীজ বুনে দিয়েছ। যারা সেই প্রেমকে অস্বীকার করে অথবা অন্যায় পথে ব্যবহার করে, তারা মানুষ নামের অযোগ্য। তুমি সমস্ত জীবের মনের কথা জান। আমি ফাহমিদাকে ভালবেসেছিলাম। তাতে আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তাও তুমি জান। কারণ তুমি সর্বজ্ঞ। তাহলে আমাকে তুমি এতবড় শাস্তি দিলে কেন? আমার তো কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না; তবু কেন এরকম করলে? যদি ফাহমিদাকে আমার জোড়া করে পয়দা না করে থাক, তবে কেন তার প্রতি প্রেমের বীজ আমার মনে অংকুরিত করে দিলে? আর এটাই যদি আমার তকদিরের লিখন হয়, তাহলে সবকিছু সহ্য করার তওফিক আমাকে দাও। নচেৎ আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নাও। আমি নাদান, নালায়েক বান্দা, কিভাবে তোমাকে ডাকতে হয় জানি না। কিন্তু তোমার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ রসুলের (সঃ) উম্মত। সেই রসুল (সঃ)এর উপর শতকোটি দরূদ ও সালাম পেশ করে বলছি, তাঁরই তোফায়েলে আমার জীবনের সব গোনাহ মাফ করে দিয়ে আমার দোয়া কবুল কর। আমিন সুম্মা আমিন।"

শামী মোনাজাতের পর কোরান শরীফ তেলাওয়াত করে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মাসুমা বিবি ছোট দেবরের ছেলে জাহেদকে মসজিদ থেকে নামায পড়ে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, শামী নামায পড়তে গিয়েছিল তাকে দেখেছ?

জাহেদ বলল, আমি যখন আসি তখনও শামী ভাই নামায পড়ছিল।

এই কথা শুনে মাসুমা বিবি নামায পড়ার জন্য পুকুর ঘাটে অজু করতে গেলেন। নামায পড়ার পরও যখন শামী এলনা তখন জাহেদকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, যাওতো বাবা শামী আসছে না কেন একটু দেখে এস।

জাহেদ ফিরে এসে বলল, শামী ভাই কোরান তেলাওয়াত করছে।

মাসুমা বিবি বললেন, তুমি তাকে ডাকনি?

জাহেদ বলল, জ্বী ডেকেছি। বলল, তুই যা আমি একটু পরে আসছি।

মাসুমা বিবি বললেন, তুমি আর একবার যাও বাবা। গিয়ে বলবে, আমি তার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছি।

জাহেদ মসজিদে গিয়ে দেখল, শামী ঘুমাচ্ছে। কয়েকবার শামী ভাই শামী ভাই বলে ডেকে সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে জাগাতে চেষ্টা করল।

শামীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখল, জাহেদ ডাকছে।

তাকে চাইতে দেখে জাহেদ বলল, চাচী আম্মা তোমাকে ডাকছে। সে ভাত বেড়ে তোমার জন্য বসে আছে।

শামী বলল, তুই আম্মাকে ভাত খেয়ে নিতে বল, আমার ক্ষিধে নেই আমি ভাত খাব না।

জাহেদ ফিরে এসে চাচী আম্মাকে সেকথা জানাল।

মাসুমা বিবি বললেন, ঠিক আছে, তুমি ঘরে যাও। উনার তখন ইচ্ছা হল, নিজে গিয়ে শামীকে ডেকে আনার। মসজিদটা একটু দূরে। তাই ইচ্ছা হলেও গেলেন না। এই কদিন ছেলে খাইনি বলে, তিনিও একরকম না খেয়ে আছেন। আজ সকালে নাস্তা খেয়েছে বলে নিজেও খেয়েছেন। এখন আবার ছেলে খেল না বলে তিনিও খেতে পারলেন না। একগ্লাস পানি খেয়ে এক খিলি পান সেজে মুখে দিয়ে স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে বসলেন।

আব্দুস সাত্তার স্ত্রীর চিঠি পেয়ে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এলেন। চিঠি পড়ে তিনি ছেলের উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন। তখন ভেবেছিলেন, বাড়ীতে গিয়ে ছেলেকে ভীষণ রাগারাগি করবেন। কিন্তু বাড়ীতে আসার পর তার অবস্থা দেখে কিছুই করতে পারলেন না। বরং খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

শামী সব সময় শুয়ে থাকে। মসজিদে নামায পড়তেও সব ওয়াক্তে যায় না। ঘরেই পড়ে। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। জোর করে কিছু খাওয়ালে বমি হয়ে যায়।

আব্দুস সাত্তার মুন্সীগঞ্জ থেকে একজন বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, না খেয়ে খেয়ে স্টোমাক খুব গরম হয়ে গেছে। তাই কিছু খেলে বমি হয়ে যাচ্ছে। বমি বন্ধের ও অন্যান্য ওষুধের প্রেসক্রিপশান করে বললেন, এগুলো এনে খাওয়ান। আর সেই সঙ্গে সব কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করুন। বাই দা বাই, রুগীর দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোন অসুখ নেই। মনে হচ্ছে, মানসিক খুব বড় আঘাত পেয়েছে। আপনারা সেই আঘাতের কারণ খোঁজ করে তার প্রতিকার

করুন। নচেৎ রুগীকে যতই ওষুধ খাওয়ান না কেন কোন কাজ হবে না। এভাবে বেশি দিন চললে রুগীকে বাঁচান মুশকিল হবে। তারপর তিনি চলে গেলেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর মাসুমা বিবি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে স্বামীকে বললেন, যা হোক কিছু কর। শামীর কিছু হলে আমি বাঁচব না।

আব্দুস সাত্তার চিন্তিত মুখে বললেন, সবর কর শামীর মা সবর কর। সবকিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। তিনি বিপদে সবর করতে বলেছেন।

মাসুমা বিবি বললেন, তা আমিও জানি। কিন্তু মন যে বোধ মানছে না। আমার অমন তরতাজা ছেলে এই কদিনে কি অবস্থা হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? বিছানার সাথে লেগে গেছে। তুমি যা হোক কিছু ব্যবস্থা কর।

আব্দুস সাত্তার বললেন, আমাকে কি তুমি আবসার উদ্দিনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেতে বলছ?

মাসুমা বিবি বললেন, হ্যাঁ, তাই বলছি। এছাড়া শামীকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। ডাক্তারও তো সেই রকম ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। তারা যা কাবিন করতে বলবে, রাজী হয়ে যেও। তাতে যদি আমাদের সব জমি জায়গা চলে যায়, তবু অরাজী হয়ো না।

আব্দুস সাত্তার বললেন, কিন্তু তুমি তো বললে, তার মেয়ের বিয়ে তার শালীর ছেলের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে। তারা খুব বড় লোক। ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে। তারা যদি আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়? না না আমি তাদের কাছে যেতে পারব না। তাতে আমাদের তকদীরে যা আছে হবে।

মাসুমা বিবি বললেন, তবু তুমি যাও। যেখানে ছেলের জীবনমরণ নিয়ে সমস্যা সেখানে মান সম্মানের কথা ভাবলে চলবে না। মান সম্মান কি আমাদের ছেলের জান বাঁচাবে? খোদা না করুন, শামীর কিছু হলে তুমি নিজের বিবেকের কাছে কি জবাব দেবে? আর তুমি সহ্য করবেই বা কি করে? তাই বলছি তুমি গিয়ে প্রস্তাব দাও। তারপর যা হবার হবে। তবু তো আমরা নিজেদেরকে বোধ দিতে পারব। এইসব বলার সময় মাসুমা বিবির চোখ থেকে পানি পড়ছিল।

আব্দুস সাত্তার স্ত্রীর করুন অবস্থা দেখে এবং তার কাতরোক্তি শুনে বললেন, চিন্তা ভাবনা করে দেখি।

স্বামীর কথা শুনে মাসুমা বিবি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি একবার রায়হান এর কাছে যাও। তাকে ডেকে নিয়ে এসে শামীকে বুঝাতে বল, তার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দেব।

আব্দুস সাত্তার রায়হানকে গ্রামের ছেলে হিসাবে এবং ছেলের বন্ধু হিসেবে ভালভাবে চেনেন। বললেন, তাই যাই তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

ঐ দিন রায়হান শামীদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে জোবেদার কাছে গেল।

জোবেদা তাকে দেখে সালাম বিনিময় করে বলল, রায়হান ভাই যে, কেমন আছেন?

রায়হান ফাহমিদার বান্ধবী জোবেদা ও রাহেলাকে ভাল ভাবেই চিনে। রাহেলার চেয়ে জোবেদা দেখতে শুনতে অনেক ভাল। রায়হান জানে ফাহমিদার সঙ্গে জোবেদার বেশি ভাব, তাই তার কাছে ফাহমিদার সব কথা জানার জন্য

এসেছে। জোবেদার কথা শুনে বলল, আল্লাপাকের রহমতে একরকম ভাল আছি। কিন্তু শামীর অবস্থা খুবই খারাপ। সেদিন ফাহমিদা শামীকে কি বলেছিল? যে জন্যে সে আজ শয্যাশায়ী। না খেয়ে খেয়ে বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে। তার মা- বাবা চিকিৎসা করিয়েও কিছু করতে পারছে না। তোমাদের বাড়ীতেইতো ওদের দুজনার সেদিন কথা হয়েছিল? তুমি কি সে সব জান?

জোবেদা ও রায়হানকে ভালভাবে চেনে, সে যে শামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু তাও জানে। বলল, হ্যাঁ জানি। তারপর ফাহমিদাও শামীর মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল সব বলল। শেষে আরো বলল, ফাহমিদা যে এরকম করবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নাই। সেদিন শামী ভাই চলে যাবার পর তার সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। তার সঙ্গে চির জীবনের মত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।

রায়হান বলল, শামীর জন্য খুব দুঃখ হয়। যে ফাহমিদাকে এত বেশি ভালবেসেছে যে, তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বেশিদিন বাঁচবে না।

জোবেদাও মনের অজান্তে অনেকদিন থেকে শামীকে ভালবাসে। শামীও ফাহমিদা দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালবাসে জেনে এতদিন নিজেকে কঠোরভাবে সংযত করে রেখেছিল, আজ আর পারল না। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, রায়হান ভাই, আপনি জেনে রাখুন, শামী ভাইয়ের কিছু হলে আমিও আপনার থেকে কম দুঃখ পাব না। আর ফাহমিদার বিচার আল্লাহ পাক করবেন। তারপর সে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

রায়হান বুঝতে পারল, জোবেদাও শামীকে গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু তা কাউকেই জানতে দেয় নাই। তার কথা শুনে রায়হানের চোখেও পানি এসে গেল। চোখ মুছে ফিরে আসার সময় চিন্তা করল, যেমন করে হউক জোবেদার সঙ্গে শামীর বিয়ে দিতে হবে।

পরেরদিন রায়হান শামীর কাছে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু রাতে খবর এল মামার খুব অসুখ। তাই সকালে মাকে সঙ্গে করে মামার বাড়ী মিরকাদিমে যেতে হল। কয়েক দিন থেকে মামার অবস্থা একটু ভালো হবার পর মাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

আব্দুস সাত্তার রায়হানদের বাড়ীতে এলে রায়হান সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন চাচা? কবে এলেন?

আব্দুস সাত্তার বললেন, আল্লাহপাকের রহমতে ভাল আছি। তিন চার দিন হল এসেছি। শামীর ব্যাপারে কথা বলব বলে এলাম। তোমার চাচী আম্মা বলেছিল, তুমি দুই একদিনের মধ্যে যাবে, দেরী দেখে খোঁজ নিতে এসেছি।

রায়হান মামার অসুখের কথা বলে বলল, গতকাল ফিরেছি। আজ আপনি না এলেও যেতাম। আসুন সদরে এসে বসুন। তারপর ওনাকে সদরে বসিয়ে চা বিস্কুট দিয়ে বলল, শামী এখন কেমন আছে?

আব্দুস সাত্তার চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খেতে খেতে বললেন, আগে যা দেখে এসেছিলে তার চেয়ে আরো খারাপ। তুমি গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিয়ের জন্য রাজি করাও।

রায়হান বলল, সে কথা আপনাকে বলতে হবে না। সেদিন তাকে বিয়ে করার কথা বলে অনেক বুঝিয়েছি। মেয়েও আমি দেখে রেখেছি। পুবপাড়ার কায়েস চাচার মেয়ে জোবেদা। কায়েস চাচাদের সব কিছুতো আপনি জানেন, এবং জোবেদাকেও আপনি দেখেছেন। শামী ও জোবেদা দুজন দুজনকে চেনে। আমার মনে হয় আপনাকে নিয়ে আমি প্রস্তাব দিলে কায়েস চাচা রাজী হয়ে যাবেন।

আব্দুস সাত্তার বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমি ওদের সবাইকে চিনি, তবে তোমার চাচী আমাকে আকসারউদ্দিনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেতে বলেছিল। এ ব্যাপারে তুমি কি বল?

রায়হান বলল, না এটা ঠিক হবেনা। কারণ উনিতো রাজী হবেনই না, প্রস্তাব দিতে গেলে আবার আপনিও অপমানিত হবেন।

আব্দুস সাত্তার বললেন, সেকথা আমারও মনে হয়েছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে চল। প্রথমে শামীকে রাজী করাও, তারপর আমরা কায়েসের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাব।

ততক্ষণ আব্দুস সাত্তারের চা খাওয়া হয়ে গেছে। রায়হান কাপ পিরিচ নিয়ে ভিতরে যাবার সময় বলল, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এগুলো রেখে আসি। একটু পরে ফিরে এসে ওনার সঙ্গে রওয়ানা হল।

বাড়ীতে এসে রায়হান শামীকে দেখে চমকে উঠলো। এই কদিনে তাকে চেনাই যায় না। তার মনে হল, শামী যেন মৃত্যুর দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে। রায়হানের চোখ দুটো আপনা থেকে পানিতে ভরে উঠলো। ভিজে গলায় বলল, শামী তুই নিজের সর্বনাশ নিজেই করছিস? সেদিন তোকে অত করে বললাম, ফাহমিদাকে মন থেকে মুছে ফেল। সে তার খালাতো ভাইকে বিয়ে করে সুখে থাকবে আর তুই তার জন্যে নিজের জীবন শেষ করতে চলেছিস। তাকে ভালবাসিস সেটা ভাল কথা, কিন্তু তাকে না পেয়ে মৃত্যুপথের যাত্রী হওয়া কি মানুষের কাজ? একটা মেয়ে যা সহজে করতে পারল, তুই পুরুষ হয়ে তা পারছিস না কেন? আমার কথা শোন, আমি তোর আব্বার সঙ্গে কথা বলেছি, জোবেদার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। তোর কোন কথা শুনব না। ঐদিন এখান থেকে ফিরে গিয়ে ফাহমিদার সংগে তোর কি কথা হয়েছিল, তা ভালো করে জানার জন্য আমি জোবেদার কাছে গিয়েছিলাম। তার কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, সে তোকে ভীষণ ভালবাসে। তোর অসুখের কথা শুনে ঝর ঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, শামী ভাইয়ের কিছু হলে সে ভীষণ দুঃখ পাবে।

শামী ম্লান হেসে বলল, জোবেদা যে ভালবাসে তা আমাকে না বললেও আমি জানি। কিন্তু আমার এই হৃদয়ে ফাহমিদা এমনভাবে গেঁথে আছে যা কোনদিন যেমন ভুলতে পারব না তেমনি অন্য কোন মেয়েকে এ হৃদয়ে স্থান দিতে পারব না। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবুও সম্ভব নয়। তুই আমাকে আর কোনদিন বিয়ের কথা বলবি না। তার চেয়ে বিষ এনে দে, তাতে বরং খুশী হব।

রায়হান কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে শামী বলল, তোকে বন্ধুত্বের দাবিতে আল্লাহপাকের কসম দিয়ে বলছি, বিয়ের ব্যাপারে আমাকে পিড়াপিড়ী করবি না, দোহাই লাগে তোকে।

এরপর রায়হান আর কিছু বলতে পারল না। শামীর কাছ থেকে বেরিয়ে এসে তার মা-বাবাকে বলল, আমি শামীকে বিয়ে করার জন্য কিছুতেই রাজী করাতে

পারলাম না। তারপর তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কসম দেবার কথা বলে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বাড়ী চলে গেল।

মাসুমা বিবি ও আব্দুস সাত্তার ছেলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

যত দিন যেতে লাগল শামীর শরীর তত ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এখন সে আর বিছানা ছেড়ে উঠতেও পারে না। আব্দুস সাত্তার হেকেমী, কবিরাজি, ডাক্তারী কোন চিকিৎসাই করাতে বাকি রাখলেন না। এমনকি ঢাকার এক পীর সাহেবের কাছে থেকে তাবিজ তদবির করালেন, কোরান খতম দিলেন, খতমে বোখারীও করালেন। কিন্তু কোন কিছুতেই শামীর শারীরিক কোন পরিবর্তন হলো না। বরং দিন দিন সে কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। ফাহমিদার সেদিনের কথাগুলো তাকে এত বেশি আঘাত করেছে যা সে সহ্য করতে পারছে না। তাই কোন আরবী কবি তার কোন এক কবিতায় লিখেছেন—

"যারা হাতো সেনানে লা মাত্তেইয়ামো
ওয়ালা ইয়ালতামো মাজারাহাল লেসানে"

"অর্থাৎ মানুষের মুখের কোন কোন কথা এই রকম বিযাক্ত ও পীড়াদায়ক যে, ধনুকের তীরের চেয়েও মারাত্মক। কারণ ধনুকের তীর কোন প্রাণীর শরীরে আঘাত করলে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং বেদনা অনুভব হয়। আবার ওষুধের মাধ্যমে তা ভাল করা যায়। কিন্তু মানুষের মুখের দ্বারা মানুষের মনে যে আঘাত লেগে ক্ষতের ও বেদনার সৃষ্টি হয়, তার কোন ওষুধ নেই। আমরণ রুগীকে পীড়া দিতে থাকে।"

কবির এই মূল্যবান কথা সত্য না মিথ্যা শামী এবং ফাহমিদা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আব্দুস সাত্তার যখন ছেলের সব রকমের চিকিৎসা করিয়ে দেখলেন, তার অসুখ ভাল না হয়ে দিন দিন বাড়ছে, তখন ডাক্তারের সংগে পরামর্শ করে মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে তার চিকিৎসা চলতে লাগল।

সাত

ফাহমিদা যেদিন শামীকে ঐসব কথা বলে এবং জোবেদার সাথে রাগারাগি করে চলে যায় তার কিছুদিন পর খালাত ভাই মালেক তাদের বাড়ীতে এলো। একদিন থেকে পরের দিন খালাকে বলল, আম্মা ফাহমিদাকে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছে।

শাকেরা খানম শুনে খুশী হয়ে বললেন, বেশ তো বাবা নিয়ে যাও। এসেছ যখন তখন আরো দু'চারদিন থাক। তারপর নিয়ে যেও।

মালেক বলল, অন্য সময় এসে থাকব। আজ বিকেলেই ওকে নিয়ে যেতে মা বলে দিয়েছে। আজ রাতে আমাদের বাড়ীতে একটা ফাংসান আছে। ফাংসানের কথাটা সে মিথ্যে করে বলল।

শাকেরা খানম বললেন, তাহলে তো তোমার আজই যাওয়া উচিত। খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে যেও। তোমার খালু আসুক, তাকে বলব।

আবসারউদ্দিন বাড়ীতে ছিলেন না। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সদরে গিয়েছিলেন। দুপুরে ফিরলেন।

খাওয়াবার সময় শাকেরা খানম স্বামীকে মালেকের কথা বললেন।

আবসারউদ্দিন বললেন, তুমি কি বল?

শাকেরা খানম বললেন, আমি আর কি বলব, খালার বাড়ী যাবে, তাতে আবার বলা-বলির কি আছে? তাছাড়া কদিন পরে তো সে তাদের বৌ হবে।

আবসারউদ্দিন বললেন, আমিও তাই মনে করি।

বিকেলে মালেক ফাহমিদাকে নিয়ে বাড়ীতে রওয়ানা দিল। মালেক গাড়ী নিয়ে এসেছিল। সে নিজেই ড্রাইভ করে। ফাহমিদা মালেকের পাশে দরজার কাছে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিল। মালেক একহাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে অন্যহাতে ফাহমিদার হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমার কাছে বস না, তোমার গায়ের গন্ধ আমার খুব ভাল লাগে। তারপর ফাহমিদার হাত ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধের উপর রেখে বলল, আমার খুব ইচ্ছা তোমাকে শিঘ্রী বিয়ে করার। তোমার মতামতটা বলবে?

মালেক তাকে ঐভাবে টেনে নিতে তার একপাশের উন্নত বক্ষ মালেকের শরীরে ঠেকে আছে। তাতে ফাহমিদার বেশ লজ্জা পেলেও সারা শরীরে অজানা এক আনন্দের শিহরণ বয়ে যেতে লাগল। তারপর বিয়ের কথা শুনে আরো বেশি লজ্জা পেয়ে কোনকথা বলতে পারল না।

তাই দেখে মালেক তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বলল, কি, কিছু বলছ না কেন?

ফাহমিদা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, প্লীজ হাতটা সরিয়ে নিন। পথিকরা দেখলে কি ভাববে? আমার লজ্জা পাইনি বুঝি?

মালেক হাতটা সরিয়ে নিতে ফাহমিদা সোজা হয়ে বসল। তারপর বলল, আমার মতামত আপনি কি বুঝতে পারেননি? না পেরে থাকলে আব্বা-আম্মার কাছ থেকে জেনে নেবেন।

মালেক বলল, তার আর দরকার নেই। এবার বল, এখনো তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন? আর বলবে না কেমন? মনে থাকবে তো?

ফাহমিদা বলল, থাকবে।

ঃ তুমি চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, লালবাগের কেল্লা, শিশুপার্ক দেখেছ?

ঃ ছোট বেলায় আব্বার সঙ্গে একবার শুধু চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম, সে সময় শিশুপার্ক দেখতে চাইলে আব্বা বলল, পরে আরেকদিন এসে দেখবি। আজ সময় হবে না।

ঃ আমি তোমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে সবকিছু দেখাব।

ঃ সত্যি বলছেন?

ঃ হ্যাঁ সত্যি বলছি। তুমি কিন্তু আবার আপনি করে বলছ।

ফাহমিদা হেসে ফেলে বলল, ভুল হয়ে গেছে, আর বলব না। মাফ করে দিন, থুড়ি দাও।

মালেকও হেসে ফেলে বলল, মনে হয় তুমি আমাকে ঠিক আপন করে নিতে পারছ না। তাই আপনি আপনি করছ।

ফাহমিদা বলল, তা ঠিক নয়। যা অভ্যেস হয়ে যায় তা পরিবর্তন করতে একটু সময় লাগে। এটা তোমার বোঝা উচিত।

মালেক বলল, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু যেখানে নিবীড় সম্পর্ক গড়ে উঠে সেখানে তোমারও ভুল হওয়া উচিত না।

তারপর তারা নানারকম গল্প করতে করতে একসময় বাড়ীতে এসে পৌঁছাল।

মালেকের মা জহুরা খানম খুশী হয়ে ফাহমিদাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, কবে যে তোকে বৌ করে ঘরে আনব সেদিনের অপেক্ষায় রয়েছি। এই মাসের মধ্যে তোর খালুকে ব্যবস্থা করতে বলব।

ফাহমিদা লজ্জা পেলেও খালাকে কদমবুসি করে বলল, আপনি কেমন আছেন?

জহুরা খানম দোয়া করে বললেন, বেঁচে থাক মা, সুখী হও। আমি ভাল আছি।

মালেক সেখানে ছিল। বলল, তুমি যে ওকে বৌ করার কথা বললে, তা খালা-খালুকে বলেছ?

জহুরা খানম বললেন, সে কথা তোকে বলতে হবে না।

মালেক আর কিছু না বলে হাসতে হাসতে নিজের রুমে চলে গেল।

রাতে খাবার সময় মালেক মাকে বলল, কাল ফাহমিদাকে নিয়ে ঢাকা বেড়াতে যাব।

জহুরা খানম বললেন, বেশ তো যাবি। ওকে ঢাকার সবকিছু দেখিয়ে নিয়ে আসবি।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনের কেউ ঘুমোতে পারল না। মালেক ভাবছে, কবে রূপসী ফাহমিদাকে একান্ত করে পেয়ে তার রূপসুধা পান করবে। সেই চিন্তা করে অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম হল না। আমেরিকায় বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সে চরিত্র হারিয়েছে। রেগুলার মদ খায়। মাঝে মাঝে নারীদেহও ভোগ করেছে। দেশে ফিরে প্রতিদিন রাতে মদ খেয়ে ঘুমোয়। বাড়ীর কেউ সে খবর জানে না। আজ মদ খেয়ে ফাহমিদাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। সে অন্য ঘরে ভাই বোনদের সঙ্গে ঘুমোচ্ছে বলে তাকে পাবার আশা নেই ভেবে তার কথা ভুলে থাকার জন্য আরো বেশি মদ খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

আর ফাহমিদা ভাবছে, সে স্কুলে পড়ার সময় যখন দু'একবার এখানে এসেছিল তখন বাড়ীঘর টিনের ছিল। কারেন্টও ছিল না। এখন বিল্ডিং ও ঘরের আসবাবপত্র দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। সে ছোট ছোট খালাত ভাইবোনেদের সাথে একরুমে অন্য খাটে ঘুমিয়েছে। তারা সব ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু ফাহমিদার চোখে ঘুম নেই। কবে সে এ বাড়ীর বৌ হয়ে আসবে, সে কথা মনে করে তার ঘুম আসছে না। ভাবল, এটাই আমার উপযুক্ত স্থান। খোদা রক্ষা করেছেন, যদি শামীর সঙ্গে বিয়ে হত, তাহলে সারাজীবন প্রেতপুরীতে কাটাতে হত। এ বাড়ীতে যেসব আসবাবপত্র রয়েছে, শামী হয়তো সেসব কোন দিন চোখেও দেখেনি। তার উপর খালা-খালুর স্নেহ ও মালেকের ভালবাসার কথা ভেবে সে সুখের স্বপ্ন সাগরে ভেসে বেড়াতে লাগল। এইসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন বেশ বেলাতে তাদের ঘুম ভাঙ্গল। গোসল করে নাস্তা খেয়ে মালেক ফাহমিদাকে নিয়ে গাড়ীতে করে ঢাকা বেড়াতে বেরোল। ঢাকায় এসে তারা প্রথমে চিড়িয়াখানা দেখল। তারপর দুপুরে একটা হোটেলে চাইনিজ খেয়ে লালবাগের কেল্লা ও নবাববাড়ী দেখে শিশুপার্কে ঢুকল। তখন বেলা শেষ। তাই সব আসনে চাপার সুযোগ পেল না। শুধু চরকায় ও ট্রেনে চাপল। সেখান থেকে বেরোতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল।

গাড়ীতে উঠে মালেক বলল, বাড়ী পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে। দেশের যা অবস্থা, রাস্তায় কোন বিপদ হতে পারে। তার চেয়ে রাতটা কোন হোটেলে থেকে সকালে যাওয়া যাবে।

ফাহমিদা কখনো হোটেলে থাকেনি। শুনেছে হোটেলে থাকার জন্য খুব ভাল ব্যবস্থা থাকে। সেখানে থাকার কথা শুনে খুশী হয়ে বলল, তুমি যা ভাল বুঝ কর।

মালেক গাড়ী নিয়ে মতিঝিলের একটা অভিজাত হোটেলে ডবল বেডের রুম নিল। মালেক যখন ফাহমিদাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে ডবলবেডের রুম নিল তখন তার মনে কেমন যেন সন্দেহ জাগল। বয় তাদেরকে রুমে রেখে চলে যাবার পর মালেককে বলল, তুমি আমাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলে কেন?

মালেক মৃদু হেসে বলল, তাতে কি হয়েছে? কিছুদিনের মধ্যে তুমি তো তাই হতে যাচ্ছ।

ঃ যখন হব তখনকার কথা আলাদা। সত্যিকথা বলা তোমার উচিত ছিল।

ঃ সত্যি কথা বললে একসঙ্গে থাকা যেত না। দুটো রুমে আলাদা আলাদা থাকতে হত।

ঃ সেটাই তো ভাল হত। একরুমে আমি ঘুমোতে পারব না।

মালেক মনে মনে একটু রেগে গেল। তা বাইরে প্রকাশ না করে বলল, কেন?

ঃ কেন আবার? তাহলে সারারাত ঘুম হবে না।

মালেক খাটের দিকে তাকিয়ে দুটো খাট একসঙ্গে রয়েছে দেখে বলল, ঠিক আছে, এক বিছানায় ঘুমোতে না চাইলে আমি আলাদা ব্যবস্থা করছি।

ঃ কি ব্যবস্থা করবে? তার চেয়ে অফিসে গিয়ে দুটো রুমের ব্যবস্থা কর।

ঃ এখন আর তা সম্ভব নয়। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ডবলবেডের রুম নিয়েছি। আবার কি বলে দুটো রুম নেব। দু'টো রুম নিতে গেলে কেলেংকারীর শেষ থাকবে না। মান সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে। তোমার মন এত ছোট কেন? একরুমে থাকলে তোমার কি এমন ক্ষতি হবে? ওসব কথা বাদ দিয়ে কাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে নাও। খেতে যেতে হবে। তারপর সে বাথরুমে ঢুকল।

ফাহমিদার মনে সন্দেহটা কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। কিন্তু কোন উপায় না দেখে একরকম বাধ্য হয়ে মালেকের কথা মেনে নিল। কাপড় পাল্টে খাটে বসে চিন্তা করতে লাগল একবিছানায় ঘুমোনো ঠিক হবে কিনা।

মালেক বাথরুম থেকে এসে কাপড় পাল্টাবার সময় ফাহমিদাকে চিন্তিত দেখে বলল, তোমার যদি একবিছানায় ঘুমোতে এতই সংকোচ, তাহলে আলাদা ব্যবস্থা করছি। তাকে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, দেখছ না দুটো খাট জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এস দু'জনে ধরে আলাদা আলাদা করে নিই।

ফাহমিদা খাট থেকে নেমে দু'জনে ধরে খাট সরিয়ে অন্যপাশের দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল। তারপর মালেক বলল, এবার নিশ্চিন্ত হলে তো? চলো এখন খেয়ে আসি।

খেয়ে আসার পর মালেক বলল, তুমি ঘুমোও, আমি একটু নিচে থেকে আসছি।

ফাহমিদার মন থেকে সন্দেহটা কাটল না। ভাবল, তবু তো একবিছানায় ঘুমোতে হল না। নিচে যাবার কথা শুনে বলল, এখন আবার কোথায় যাবে?

মালেক বলল, সে কথা জেনে তোমার কোন লাভ নেই, তুমি ঘুমোও। কথা শেষ করে সে বেরিয়ে গেল।

ফাহমিদা খাটে বসে বেশ কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর শুয়ে পড়ে ভাবল, এতরাতে কোথায় যেতে পারে? সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জেগে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে শরীরের ওপর অনেক ধকল গেছে; তাই কখন যে তার চোখে ঘুম নেমে এল তা সে জানতে পারল না, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

মালেক রুম থেকে বেরিয়ে বারে এসে অনেকক্ষণ বসে বসে মদ খেল। তারপর যখন সে রুমে ফিরে এল তখন ফাহমিদা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার খাটের দিকে চেয়ে দেখল সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার যৌবনপুষ্ট উন্নত বক্ষ শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে সাথে উঠানামা করছে। একদিকের বুকের কাপড় সরে গেছে। মাতাল অবস্থায় নিশীথ রাতে নির্জন রুমে একটা যুবতী মেয়েকে ঐ অবস্থায় দেখে কোন যুবক কি সংযত থাকতে পারে? পারে না। "সে জন্যে আল্লাহ্‌পাক ও তাঁর রসুল (সাঃ) গায়ের মোহররম (যাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েজ) মেয়ে পুরুষকে একসঙ্গে নির্জনে থাকা হারাম করেছেন।" মুসলমানরা কোরআন হাদিসের কথা না জেনে এবং জেনেও না মেনে হারাম কাজ করে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আজ মুসলমানদের উপর আল্লাহর গজব নেমে এসেছে।

ফাহমিদাকে ঐ অবস্থায় দেখে মালেক নিজেকে সংযত রাখতে পারলনা। বাজ পাখির মত তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর চুমোয় চুমোয় মাতিয়ে তুলে নিরব ভাষায় তাকে নতুন পথে আহবান করতে লাগল।

ফাহমিদা জেগে ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে প্রথমে ভীষণ প্রতিবাদ করতে লাগল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তিও করল। কিন্তু একজন বলিষ্ঠ মাতাল যুবকের সঙ্গে কতক্ষণ আর পারবে? শেষে কেঁদে কেঁদে অনেক অনুনয় বিনয় করেও কিছু ফল হল না। তাছাড়া তার শরীরও যেন কিছু একটা পাবার আশায় মেতে উঠল। শেষে শরীরের আহবানে সাড়া দিতে বাধ্য হল। এরপর যা ঘটার তা ঘটে গেল।

ফাহমিদার শরীর ও মনের তাণ্ডব যখন থেমে গেল তখন সে বাস্তবে ফিরে এল। ধাক্কা দিয়ে মালেককে সরিয়ে কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে রূঢ়কণ্ঠে বলল, জানতাম না, তুমি একজন মাতাল ও লম্পট। আজ বুঝতে পারলাম মদ ও নারী না হলে তোমার চলে না। নারীদের সতীত্ব নিয়ে খেলা করা তোমার কাজ। তুমি খালাত ভাই বলে এবং সৎ জেনে তোমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলাম। আমার মা বাবাও তাই জেনে তোমার সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ দিয়েছে। আর তুমি কিনা এতবড় জঘন্যতম কাজ করতে পারলে? তুমি নরকের কীটের চেয়েও অধম। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

তুমি এতবড় পাপিষ্ঠ, আমার সর্বনাশ করে ছাড়লে। তোমার সুন্দর চেহারার মধ্যে যে এরকম পশুত্ব লুকিয়ে রয়েছে, তা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতাম, তাহলে তোমার সঙ্গে বেড়াতে আসতাম না। রাতে বাড়ী ফিরতে পথে বিপদের ভয় দেখিয়েছিলে, তোমার এই জঘন্য মনোবৃত্তি পূরণ করার জন্য। এরপর তোমাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। বিষ খেয়ে মরব, তবু তোমাকে বিয়ে করব না। না জানি এর আগে কত মেয়ের সতীত্ব তুমি নষ্ট করেছ। তারপর মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ফাহমিদার কথার উত্তর দেবার মত অবস্থা তখন মালেকের নেই। মাতাল অবস্থায় ঐ কাজ করে তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল। ফাহমিদা অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন মালেককে তার পাশে শুয়ে থাকতে দেখে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে ডেকে সাড়া না পেয়ে বুঝতে পারল, সে ঘুমোচ্ছে। তখন সে বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল। তারপর জামাকাপড় পরে অন্যখাটে ঘুমোতে গেল। অনেকক্ষণ তার চোখে ঘুম এল না। তখন তার মানসপটে শামীর সরল, সুন্দর ও পবিত্র মুখ ভেসে উঠল। এতবছর তার সাথে মেলামেশা করলাম, কই একদিনের জন্যেও সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে স্পর্শ করেনি। এই সব ভাবতে ভাবতে শামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা মনে করে তার ভীষণ অনুশোচনা হল। মনের অজান্তে চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। শেষে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা সাতটার সময় মালেকের ঘুম ভাঙ্গল। উঠে বসে দেখল, ফাহমিদা অন্য খাটে ঘুমোচ্ছে। সে যে সারারাত কেঁদেছে তা তার ঘুমন্ত মুখে বেশ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। তার এই মুখচ্ছবি মালেকের কাছে খুব সুন্দর বলে মনে হল। তৃপ্তির হাসি হেসে বাথরুমে গোসল করতে গেল। গোসল করে এসে জামা কাপড় পরে ফাহমিদাকে জাগাবার জন্য গায়ে হাত দিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল।

ফাহমিদা জেগে গিয়ে উঠে বসে খুব রাগের সঙ্গে বলল, তুমি আর কখনো আমাকে ছুঁবে না। আমাকে এক্ষুণি বাড়ী পৌঁছে দাও। তোমার মত লম্পটের সাথে আর একদণ্ড থাকতে ইচ্ছা করছে না।

মালেক রেগে গেলেও ধৈর্য্য হারাল না। বলল, কালরাতেও অনেক কিছু বলে গালাগালি করেছ। আবার এখনও তাই শুরু করেছ। বলি এত তোমার অহংকার কিসের, রূপের? আমেরিকায় তোমার চেয়ে হাজারগুণ বেশি রূপসী মেয়ের যৌবন সুধা পান করেছি। তাদের তুলনায় তুমি কিছুইনও। যাকগে যা হবার তা হয়ে গেছে। এটা তো একটা সাধারণ ব্যাপার। একে নিয়ে এত কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাটি ঠিক নয়। তাছাড়া কয়েকদিন পর যখন তুমি আমার বৌ হতে যাচ্ছ তখন এত দ্বিধা বা সংকোচ কেন? আমেরিকার ছেলেমেয়েরা এটাকে একটা দৈহিক ব্যাপার মনে করে। এটা তাদের কাছে গৌণ ব্যাপার। আসল হল মন। যেখানে মনের মিল সেখানে গৌণ ব্যাপার নিয়ে তারা কোনদিন মাথা ঘামায় না।

ফাহমিদা কর্কশ কণ্ঠে বলল, এটা আমেরিকা নয়, বাংলাদেশ, আর তারা মুসলমানও নয়। যদি তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান থেকেও থাকে, তবে তারা মোনাফেক।

মালেকও রাগের সঙ্গে বলল, বাংলাদেশের অত বড়াই করতে হবে না। এখানেও উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে ডেটিং করে। বিয়ের আগে সিলেক্ট করা পাত্র-পাত্রীরা বেড়াতে যাবার নাম করে এইসব করে। আর তারাও মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়ে।

ফাহমিদা বলল, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বাংলাদেশের মুসলমানও মোনাফেক হয়ে যাচ্ছে। অতি শীঘ্র এই দেশের উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে। অত কথা শুনতে চাই না, তুমি এক্ষুণি বাড়ী নিয়ে যাবে কিনা বল, নচেৎ আমি নিজেই তার ব্যবস্থা করব।

মালেক ভেবেছিল, আজ দিনে আর একবার তাকে ভোগ করে বিকেলে বাড়ী ফিরবে। ফাহমিদার কথা শুনে চিন্তা করল, বেশি চাপাচাপি করলে হিতে বিপরীত হবে। তাই রাগকে সংযত করে বলল, নিচে গিয়ে নাস্তা খেয়ে আসি চল। তারপর বেরোন যাবে।

ফাহমিদা দৃঢ়স্বরে বলল, তুমি খেয়ে আসতে পার, আমি কিছু খাব না।

মালেক তার দৃঢ়স্বর শুনে আর কিছু না বলে নাস্তা খেতে একা বেরিয়ে গেল। আধঘন্টা পর ফিরে এসে দেখল, ফাহমিদা রেডী হয়ে বসে আছে। সে নিজের জামাকাপড় ব্রীফ থেকে ভরে নিল। তারপর হোটেল ছেড়ে দিয়ে ফাহমিদাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠল।

টঙ্গিবাড়ী যাবার রাস্তা আলদি বাজার থেকে অল্প দূরে। গাড়ী যখন আলদি বাজারের কাছাকাছি এল তখন ফাহমিদা বলল, আমাদের গ্রামের রাস্তার মোড়ে আমাকে নামিয়ে দেবে।

মালেক বলল, কেন?

ফাহমিদা অগ্নি দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল, কেন জিজ্ঞেস করতে তোমার লজ্জা করল না? যা বলছি তাই কর। তারপর দরজার লক খুলে একটু ফাঁকা করে বলল, যদি গাড়ী না থামাও, তাহলে লাফ দেব।

মালেক ফাহমিদার অগ্নিমূর্তি দেখে ভয় পেল। চিন্তা করল, সত্যিসত্যি যদি লাফ দেয়? তার ইচ্ছা ছিল বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে মাকে বলবে আজকালের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তার মতিগতি দেখে ভাবল, সে যদি সত্যিই লাফ দেয়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আমাদের বাড়ীতে যখন যাবে না তখন তোমাকে রাস্তার মোড়ে নামাব কেন? একেবারে তোমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিই। খালা-খালুকে বলব, তারা যেন আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করেন।

ফাহমিদা গর্জে উঠল, তুমি ভেবেছ এরপরও আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হব? আমাদের বাড়ীতে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি তাদেরকে তোমার চরিত্রের গুণাগুণ করে আজই খালা-খালুর কাছে আমাদের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার খবর পাঠিয়ে দিতে বলব। তোমার মত মদখোর, মাগী খোর ছেলের সঙ্গে জেনে শুনে আমার বাবা-মা বিয়ে দেবে ভেবেছ?

ততক্ষণে আলদি বাজারের রাস্তার মোড়ে গাড়ী পৌঁছে যেতে ফাহমিদা চিৎকার করে বলল, গাড়ী থামাও বলছি নচেৎ যা বললাম তা সত্যি সত্যি করে ফেলব।

অগত্যা মালেক গাড়ী থামাতে বাধ্য হল। ফাহমিদা নেমে যেতে বলল, তোমার জন্যে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। এই সামান্য জিনিস নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করবে জানলে বিয়ের আগে তোমার গায়ে হাত দিতাম না। তুমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলে কলেজে পড়লেও তোমার মনের সংকীর্ণতা কাটেনি। তবে এত বাড়িবাড়ি না করলেও পারতে। যাচ্ছ যাও, শেষ মেস একটা কথা না বলে পারছি না, তুমি খালাত বোন বলে ছেড়ে দিলাম। অন্য কেউ হলে লাশ হয়ে গ্রামে ফিরত। তারপর সে গাড়ী ছেড়ে দিল।

জহুরা খানম ছেলেকে একা গাড়ী থেকে নামতে দেখে আতংকিত স্বরে বললেন, কিরে ফাহমিদা কোথায়?

মালেক গম্ভীর স্বরে বলল, তাকে তাদের বাড়ীতে রেখে এসেছি।

ঃ তাকে নিয়ে এলি না কেন?

ঃ যে আসবে না তাকে আনব কেমন করে?

জহুরা খানম ছেলের মন খারাপ দেখে ভাবলেন, ফাহমিদা আসেনি বলে মন খারাপ হয়ে আছে। বললেন, ঘরে গেছে ভাল কথা। তাতে তুই মন খারাপ করছিস কেন? আমি তোর আব্বাকে বলে যত শিঘ্রী পারি তাকে বৌ করে আনার ব্যবস্থা করছি।

মালেক, কিছু না বলে নিজের রুমের দিকে চলে গেল।

এদিকে ফাহমিদাকে ঐ অবস্থায় একা ফিরতে দেখে শাকেরা খানমও আতংকিত স্বরে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে তোর চেহারা এরকম কেন? তুই একা এলি নাকি?

এতটা পথ দুপুরের প্রখর রোদে হেঁটে এসে ফাহমিদার ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে। সে খুব ক্লান্তি বোধ করছিল। মায়ের কথার উত্তরে শুধু বলল, তোমার গুণধর ভাগ্না পাকা রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর সে আর দাড়াল না, নিজের রুমের দিকে চলে যেতে লাগল।

শাকেরা খানম বেশ অবাক হয়ে বললেন, চলে যাচ্ছিস কেন? দাঁড়া। মালেক এল না কেন?

ফাহমিদা দাঁড়াল না। যেতে যেতে বলল, কেন এলনা তা আমি কি করে বলব? সে এলে জিজ্ঞেস করো।

শাকেরা খানম মেয়ের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, নিশ্চয় মালেকের সঙ্গে কোন ব্যাপারে মনোমালিন্য হয়েছে। ফাহমিদা এখন রেগে আছে। রাগ পড়লে পরে জিজ্ঞেস করা যাবে, এই কথা ভেবে নিজের কাজে মন দিলেন।

বিকেলে শাকেরা খানম মেয়ের রুমে গিয়ে দেখলেন, ফাহমিদা কাপড় পাল্টাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবি?

ফাহমিদা বলল, একটু জোবেদার কাছে যাব।

শাকেরা খানম আবার জিজ্ঞেস করলেন, মালেক এল না কেন তখন বললি না যে?

ফাহমিদা কাপড় পড়া শেষ করে মালেকের ক্রিয়া কলাপ যতটা সম্ভব বলে

কেঁদে ফেলল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, একটা মদখোর, মাগী খোর ছেলের সাথে তোমরা যদি আমার বিয়ে দাও, তাহলে আত্মহত্যা করব।

শাকেরা খানম মেয়ের মুখে মালেকের চরিত্রের অবনতির কথা শুনে খুব অবাক হলেন। বললেন, সত্যি সে যদি ঐরকম ছেলে হয়, তাহলে তোর আব্বাকে বলে বিয়ে ভেঙ্গে দেব।

ফাহমিদা কিছু না বলে জোবেদার বাড়ীতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

জোবেদা তাকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। ঝাঁঝালো স্বরে বলল, তোকে না আমাদের বাড়ীতে আসতে নিষেধ করেছিলাম? আর তুইও তো সেদিন আসবিনা বলে গরব দেখিয়ে চলে গেলি। আজ আবার হঠাৎ কি মনে করে? শামী ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে খুশী হতে এসেছিস বুঝি?

ফাহমিদা জোবেদার কথা শুনে চমকে উঠে কেঁদে ফেলল। তারপর তাকে ঝড়িয়ে ধরে বলল, কি বললি, শামী নেই? আল্লাহ গো তুমি একি খবর শোনালে? আমি যে তার কাছে মাফ চাইতে পারলাম না। সে না মাফ করলে আমি যে তোমার কাছেও মাফ পাব না। তারপর জোবেদাকে ছেড়ে দিয়ে তার দুটো হাত নিয়ে নিজের গলায় চেপে ধরে বলল, তুই আমাকে গলা টিপে মেরে ফেল। আমি যে কত বড় ভুল করেছি, তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি। সেই জন্য তো তোর কাছে ছুটে এলাম শামী ভাইয়ের কাছে মাফ চাইতে যাব বলে। আর তুই যে কথা শোনালি তা কি সত্যি? বল জোবেদা বল।

জোবেদা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, তুই বড় দেরী করে ফেলেছিস। কয়েকদিন আগে যদি তোর ভুল ভাংত তাহলে শামী ভাই হয়তো বেঁচে যেত। এখন যা অবস্থা এই আছে তো এই নেই। আমি রায়হান ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। সে প্রতিদিন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় শামী ভাইকে দেখতে। আজ আসতে এত দেরী করছে কেন কি জানি? জানিস, যেদিন তুই শামী ভাইকে ঐসব কথা বলে বিদায় করে দিলি সেদিন থেকে শামী ভাই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শুধু তোর নাম বিড়বিড় করে বলত। কয়েক দিনের মধ্যে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। আমি ও রায়হান ভাই কত করে তোকে ভুলে যাবার জন্য বুঝিয়েছি। আব্দুস সাত্তার চাচা যত রকমের চিকিৎসা আছে, সব করিয়েছেন, তাবিজ তদ্বীরও অনেক করিয়েছেন। এই সব করাতে গিয়ে জমি জায়গা বিক্রি করে একরকম নিঃস্ব হয়ে গেছেন। শেষে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন। হাসপাতালের ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, শামী ভাই আর বাঁচবে না। যে কোন সময়ে মারা যাবে। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এই কথা ভেবে চিকিৎসা চলছে। ডাক্তাররা তার ভালবাসার কথা শুনে বলেছিলেন, যদি মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে অন্য একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দেন। নচেৎ ওকে বাঁচান যাবে না। ডাক্তারের কথা শুনে আব্দুস সাত্তার চাচা রায়হানের ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আব্বার কাছে এসে আমার সঙ্গে শামী ভাইয়ের বিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন। উনার সঙ্গে রায়হান ভাইও এসেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, জোবেদা তুমিই একমাত্র শামীকে বাঁচাতে পার। আমি বললাম, বলুন কি করতে হবে। রায়হান ভাই বললেন, তুমি শামীকে বিয়ে কর। আমাদের বিশ্বাস, তুমি তোমার প্রেম ভালবাসা দিয়ে শামীর মন থেকে ফাহমিদার কথা

ভুলাতে পারবে। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, তাই যদি আপনারা মনে করেন, তাহলে শামী ভাইকে বাঁচাবার জন্য আমি রাজি। কিন্তু আব্বা কিছুতেই রাজি হল না। বলল, একটা মৃত্যু পথযাত্রী ছেলের সঙ্গে জেনেশুনে বিয়ে দিয়ে আমার মেয়ের জীবন নষ্ট করতে পারব না। আর লোকজন শুনলে আমাকে কি বলবে, আপনারা ভেবে দেখেছেন? আমি আমার নিজের কাছেও খুব ছোট হয়ে যাব। না না, এ প্রস্তাব আমি কখনই মেনে নিতে পারি না। আপনারা চলে যান। আব্বার কথা শুনে আমি রায়হান ভাইকে গোপনে বললাম, আব্বাকে রাজি করাবার দরকার নেই। শামী ভাইকে দেখতে আমি তো রোজ হাসপাতালে যাই। আজ যখন যাব তখন সেখানেই বিয়ে পড়িয়ে দেবেন। আপনারা আগের থেকে হাসপাতালে কাজী সাহেবকে হাজীর রাখবেন। উনারা সবকিছু করেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম, কিন্তু শামী ভাই কিছুতেই রাজি হলেন না। সবাই অনেক করে বোঝাল। তাতেও কিছু হল না। শেষে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে আমি তার পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, শামী ভাই, তুমি জান কিনা জানি না, আমি তোমাকে বহুদিন আগে থেকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। তুমি ফাহমিদাকে ভালবাস জানতে পেরে তা কোনদিন তোমাকে জানাইনি। আর কোন দিন জানাতামও না। তোমার অবস্থা দেখে আজ বাধ্য হলাম। তুমি আমাকে বিয়ে করে দেখ, আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে হলেও প্রেম ভালবাসা দিয়ে এবং সেবা শুশ্রূষা করে তোমাকে ভাল করে তুলবই। শামী ভাইয়ের তো নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। তাই শুধু চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আমি তা জানি জোবেদা। কিন্তু এতদিন যখন সেকথা গোপন রেখেছিলে তখন প্রকাশ করা তোমার উচিত হল না। তুমি নিশ্চয় জান, ফাহমিদাকে আমি কত ভালবাসি। তাকে ছাড়া জীবনে অন্য কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে কখনো যে তাকাইনি তাও তুমি জান। এতকিছু জেনেও কেন এরকম করলে? আমার হায়াত যতদিন আছে ততদিন ফাহমিদা ছাড়া অন্য কোন মেয়ের কথা আমি ভাবতে পারব না। তাছাড়া মনে হচ্ছে আমার হায়াৎ আর বেশি দিন নেই। তার আগে যদি একবার ফাহমিদাকে দেখতে পেতাম, তাহলে শেষ বাসনা পূরণ হত। জোবেদা যখন এইসব কথা ফাহমিদাকে বলছিল তখন তার চোখের পানি দুগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে চোখ মুখ মুছে বলল, এবার বল দেখি তোর ভুল ভাঙ্গল কি করে? তোর খালাত ভাইয়ের সঙ্গে তো বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। তার গাড়ীতে চড়ে একদিন তোকে কোথায় যেতেও দেখলাম। এই কয়েক দিনের মধ্যে কিসে কি হল বল?

জোবেদার কথা শুনতে শুনতে ফাহমিদার চোখ থেকেও অঝোরে পানি পড়ছিল। তখন তার মনে হল, আমি বেশি লোভের বশবর্তী হয়ে শামীকে ফিরিয়ে দিয়েছি বলে আমার সব স্বপ্ন আল্লাহ পাক ধূলিস্যাৎ করে দিলেন। সে জোবেদার কথার উত্তরে তার খালাত ভাই মালেকের চরিত্রের সব কিছু খুলে বলল। তারপর জোবেদার গলা ধরে জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বলল, আমাকে শামীর কাছে নিয়ে চল। আমি তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। সে ক্ষমা না করলে আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করবে না।

জোবেদা বলল, শামী ভাই একদিন আমাকে একটা খাম দিয়ে বললেন,

ফাহমিদার সঙ্গে যদি কোনদিন তোমার দেখা হয়, তাহলে তাকে দিয়ে বলো, এটা যেন সে মেহেরবাণী করে পড়ে। দাঁড়া সেটা তোকে এনে দিচ্ছি। তারপর একটা বাক্স থেকে খামটা বের করে এনে তার হাতে দিয়ে বলল, আমাকে পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি পড়েছি। তোর জিনিস তুই পড়ে দেখ। ফাহমিদা খাম থেকে একটা কাগজ বের করে দেখল, তার দু'পৃষ্ঠায় লেখা দুটো কবিতা। পড়ত শুরু করল, প্রথম পৃষ্ঠার কবিতার নাম অহংকারীনি, কবি আব্দুস শামী।

পাঁচ বছর পূর্বের কথা
মনে আছে কি তোমার?
সেদিন তুমি প্রহর গুণেছিলে
অপেক্ষায় ছিলে আমার।
আজ তুমি আমায় দেখে
অভিনয়ের স্বরে ডাক,
রাস্তা ঘাটে আমায় দেখে
অবহেলা দেখিয়ে থাক।
আধুনিকা মেয়েরা এত যে পাষাণী
জানতাম না আমি এর পূর্বে,
হামসে খুব সুরতওয়ালী কৌন হ্যায়
এই কথা ভেবে চল বুক ফুলিয়ে গর্বে।
রূপসী ও ধনবতী কন্যা বলে
গরীবে করেছ যথেষ্ট অপমান,
রূপ নিয়ে শুধু চোখ ঝলসান যায়
মনকে জয় করা যায় না কখন।
হ্যাঁ, আছে একদল মানুষ নামের কলংক
হিংস্র মেজাজের পশু,
রূপ দেখলে পাগল হয়ে যায় তারা
হুঁশ বুদ্ধি তাদের ঠিক থাকে না কিছু।
তোমার মত অহংকারী ম্যাডাম
শত শত আছে বাজারে সমান।
আশ্রয় তাদের পতিতালয়ে
তাদের শরীরের উপর দিয়ে যায় কত ঝড় তুফান।
রূপের গর্ব যদি থাকে তোমার ওগো রূপসী–
একবার যেয়ে দেখনা না সেখানে,
অহংকার তোমার হবে চূরমার
শত রূপবানের ভক্ষনে।

ফাহমিদা প্রথম পৃষ্ঠার কবিতাটা শেষ করে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কবিতাটা পড়তে লাগল। কবিতার নাম—

"হে প্রভু"

তোমার করুণা কাম্য মোদের
দাও হে শক্তি দাও হে প্রভু,
থাকিতে পারি যেন মোরা
মিলন লগ্নাপেক্ষায় শুধু।
হে প্রভু, বিচলিত না হই যেন,
মোদের অন্তরে দাও সে শক্তি,
মোরা যে দুর্গম পথের যাত্রী
কেটেছে কত দিবা রজনী।
অকুল সাগরে খোদা, তুমিই ভরসা—
তুমিই মোদের একমাত্র আশা।
তোমারি নামে করেছি শপথ
চিরকাল আমি ভুলব না তারে,
এই বিশ্বাস থাকে যেন মোর উপরে
হে খোদা তুমি সেই জ্ঞান দাও গো তারে।
হে প্রভু আমি যে নিঃস্ব
কি দিয়ে সুখী করব তারে,
আছে শুধু পবিত্র ভালবাসা,
সেটাই স্থান পায় যেন তারই অন্তরে।

ফাহমিদা কবিতাটা পড়ে ভাঁজ করে খামের ভিতর রাখল। তারপর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে জোবেদার দিকে তাকিয়ে বলল, শামীর কথাই ঠিক, আজ আমার রূপের সকল অহংকার চূর্ণ হয়েছে। তারপর আবার বলল, কিরে আমাকে শামীর কাছে নিয়ে যাবি না?

জোবেদা বলল, হ্যাঁ নিয়ে যাব। আর একটু অপেক্ষা কর, রায়হান ভাই আসুক।

এমন সময় রায়হান জোবেদাদের সদরে এসে তার ছোট বোন জয়তুনকে দেখতে পেয়ে জোবেদাকে ডেকে দিতে বলল।

জয়তুন জোবেদার কাছে গিয়ে বলল, আপা তোমাকে রায়হান ভাই ডাকছেন।

জোবেদা এতক্ষণ ফাহমিদার সঙ্গে নিজের রুমে কথা বলছিল। ছোট বোনের কথা শুনে ফাহমিদাকে সঙ্গে নিয়ে সদরে এল।

জোবেদার সঙ্গে ফাহমিদাকে দেখে রায়হান বেশ অবাক হল। সেই সঙ্গে রাগে তার চোয়াল দুটো আপনা থেকে শক্ত হয়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে জোবেদাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তাড়াতাড়ি এস, এমনি অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ফাহমিদা রায়হানের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। সে একরকম ছুটে এসে বসে পড়ে তার পায়ে হাত রেখে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, রায়হান ভাই, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি। আমাকে বোনের মত মনে করে ক্ষমা করে দিয়ে শামীর কাছে নিয়ে চলুন। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইব।

আমার বিশ্বাস, সে নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবে। তারপর সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

রায়হান কঠিন পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

জোবেদা বলল, আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন রায়হান ভাই। সত্যি সত্যি ওর ভুল ভেঙ্গেছে। তাই আমার কাছে এসে সেকথা জানিয়ে কান্নাকাটি করে শামীর ভাইয়ের কাছে যাবার জন্য ছট ফট করছে। অপরাধী যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চায় তখন তাকে ক্ষমা করাই তো মহত্ত্বের লক্ষণ। "আল্লাহ পাক ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা করেন। আর যারা ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা করে তাদেরকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন।" এটা হাদিসের কথা। হাদিসে আরো আছে, "রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, এমরানের পুত্র মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রভু! তোমার নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে? আল্লাহ বলিলেন, ক্ষমতাশীল হইয়াও যে ক্ষমা করে।" [১] এসব কথা আমি মূর্খ হয়ে আপনাকে আর কি বলব। আপনি তো আলেম লোক। আপনাকে এই সব বলে বেয়াদবি করে ফেললাম। সেজন্য ক্ষমা চাইছি।

রায়হান ফাহমিদাকে দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কারণ তারই জন্য প্রীয় বন্ধু শামী আজ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। জোবেদার কথা শুনে তার রাগ পড়ে গেল। বলল, জোবেদা, হাদিসের কথা বললে বেয়াদবি হয় না। বলে বরং আমার উপকার করলে, তোমার কথা শুনে রাগ পড়ল। নচেৎ ফাহমিদাকে হয়তো যাতা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিতাম। তারপর ফাহমিদার হাত ধীরে তুলে দাঁড় করিয়ে বলল, তুই বড় দেরী করে ফেলেছিস বোন। আয় আমাদের সঙ্গে। এই কথা বলে হাঁটতে শুরু করল।

আজ সকালে ডাক্তার শামীর আব্বাকে বলে দিয়েছেন, আপনার ছেলের কোন সখ সাধ থাকলে মিটিয়ে দিন। তার অবস্থা ভাল নয়। আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু হায়াৎ মউতের ব্যাপার আল্লাহ্ পাকের হাতে। আমরা বুঝতে পারছি তার কয়েক ঘন্টা তার আয়ু আছে। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিন।

আব্দুস সাত্তার নিজেও তা বুঝতে পেরেছেন। ডাক্তারের কথা শুনে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তারা আর বাড়ী ফিরে যাননি।

রায়হান, জোবেদা ও ফাহমিদা তখনও হাসপাতালে গিয়ে পৌছায়নি। শামী একবার করে কাতর চোখে সবাইয়ের দিকে চেয়ে নিরাশ হয়ে চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। কিছু বলতে গিয়েও বলছে না।

মাসুমা বিবি তা বুঝতে পেরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ছেলের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তুমি কি কাউকে দেখতে চাচ্ছ?

শামী কোন কথা না বলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল, আর তার চোখ দিয়ে পনি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এমন সময় রাহয়ান ওদেরকে নিয়ে এসে বলল, চাচী আম্মা আপনি একটু সরুন তো?

টীকা ঃ ১ বর্ণনায়ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বাইহাকী

মাসুমা বিবি সোজা হয়ে পাশে সরে বসলেন। রায়হানের গলা পেয়ে শামী তার দিকে চেয়ে বলল, দোস্ত চললাম, কোন দোষত্রুটী করে থাকলে ক্ষমা করে দিস। তারপর মা বাবার দিকে চেয়ে বলল, আমি তোমাদের নাদান নালায়েক ছেলে। তোমাদের মনে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমার চিকিৎসার জন্যে তোমরা নিঃস্ব হয়ে গেছ। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমার জন্য আল্লাহ পাকের আছে দোওয়া করো, "তিনি যেন আমাকে নাজাত দেন। তারপর জোবেদাকে দেখে বলল, তোমার মনেও অনেক কষ্ট দিয়েছি। তুমিও আমাকে ক্ষমা করে দিও।

ফাহমিদা এতক্ষণ জোবেদার পিছনে ছিল। তাকে শামী দেখতে পাইনি। সে আর থাকতে পারল না। শামীর কাছে এগিয়ে এসে দরবিগলিত চক্ষে বলল, শামী এই হতভাগী পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করে দাও। নচেৎ জাহান্নামেও আমার জায়গা হবে না। তুমি না ক্ষমা করলে ইহকালে ও পরকালে আমার নাজাতের কোন উপায় নাই। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও শামী। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা পাবার জন্য তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তোমাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ফাহমিদাকে দেখে ও তার কথা শুনে শামীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, তুমি সেই এলে, তবে বিদায় বেলায়। এখন আমি যে নিঃস্ব হয়ে পর পারের যাত্রী। তোমাকে দেবার মত আজ আমার কিছুই নেই। আছে শুধু ভগ্ন হৃদয়ের পূর্ণ ভালবাসা। তা কি গ্রহণ করবে? আর করেই বা কি হবে? যার আয়ু শেষ, তার ভালবাসার এককানাকড়িও পৃথিবীর মানুষের কাছে মূল্য নেই। আত্মীয় স্বজনেরা মৃত্যুর পর মাত্র কয়েকদিন মায়া কান্না কাঁদে। তারপর কালের পরিবর্তনে মানুষ বর্তমানের স্রোতে অতীতের সবকিছু ভুলে যায়।

ফাহমিদা বলল, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি আমাকে ক্ষমা করে এই পবিত্র পায়ে ঠাঁই দাও। নচেৎ আমার ধ্বংস অনিবার্য। এইকথা বলে সে শামীর দু'পা জড়িয়ে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

শামী কিছুক্ষণ নিথর হয়ে থেকে বলল, ক্ষমা তুমি পেয়েছ। আল্লাহ পাক তোমাকে যেন ক্ষমা করেন। এখন কান্না থামিয়ে উঠে বস। বিদায় বেলায় তোমার মুখের হাসি দেখতে চাই। তুমি আমাকে ভুল বুঝলেও আমি তোমাকে বুঝিনি। জানতাম, একদিন না একদিন তোমার ভুল ভাঙ্গবে। সেদিন তুমি আবার আমার কাছে ছুটে আসবে। আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে। আল্লাহ পাক আমার শেষ বাসনাটুকু পূরণ করলেন। দীলে দীলে আল্লাহকে জানিয়ে আসছিলাম, শেষ মুহূর্তে একবারের জন্য হলেও যেন তোমাকে দেখান। আল্লাহ পাক এই নাদান গোনাহগার বান্দার সেই ইচ্ছা পূরণ করিয়ে আমাকে ধন্য করলেন। সে জন্যে তাঁর পাক দরবারে শত কোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি। এবার মরে গিয়েও আমি শান্তি পাব। তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে রায়হানের দিকে চেয়ে বলল, দোস্ত, ফাহমিদা যদি কোনদিন তোর কাছে কোন বিষয়ে সাহায্য চায়, তাহলে তাকে সাহায্য করবি।

শামীর কথা শুনতে শুনতে সকলের চোখ থেকে পানি পড়ছিল। তাই দেখে শামীর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমরা আমার জন্য কান্নাকাটি না করে আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া কর। তারপর মায়ের দিকে চেয়ে বলল, আম্মা

আমাকে একটু পানি খাওয়াও তো, শেষবারের মত তোমার হাতের পানি খেয়ে নিই।

মাসুমা বিবি তাড়াতাড়ি পানি এনে চামচে করে ছেলের মুখে দিলেন।

পানি খেয়ে শামী সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কলেমা শাহাদাৎ পড়তে পড়তে নিথর হয়ে গেল।

রায়হান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য ছুটে গেল।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, উনি আর ইহজগতে নেই। "ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন।"

ডাক্তারের কথা শুনে আব্দুস সাত্তার ও রায়হান ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন পড়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন, অনন্যরা সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

শুধু ফাহমিদা মুক ও বধির হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সমাপ্ত